ইজাহুত্ তারীকাহ

সাইয়্যেদুনা ও মাওলানা কেবলা হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী (রাহ:)

উর্দূ তরজমা

হযরত মাওলানা মানজুর আহমাদ সাহেব

(মদীনা মুনাওয়ারাহ)

বাংলা তরজমা

এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্শী

খানকাহ সিরাজিয়া নক্শেবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া

কুন্দিয়ান, জিলা- মিয়ানওয়ালী, পাকিস্তান

প্রকাশনায় ঃ খানকাহ সিরাজিয়া

১, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।

ইজাহুত্ তারীকাহ

(তারীকাহ এর বিশ্লেষণ)

সাইয়্যেদুনা ও মাওলানা কেবলা হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী (রাহ:)

(মাকাতিবে শরীফা থেকে, মাকতুব নং ৮৫ ও ৯০ ফার্সী)

উর্দূ তরজমা

হযরত মাওলানা মানজুর আহমাদ সাহেব

(মদীনা মুনাওয়ারাহ)

বাংলা তরজমা

এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্শী

॥ ছাপার অনুমতি প্রদান ॥

শায়খুল মাশায়েখ সাইয়্যেদুনা ও মুরশেদুনা কেবলা

হযরত মাওলানা আবুল খলীল খান মোহাম্মাদ সাহেব মাদ্দাজিল্লুহুল আলী

মাসনাদ আফরোজে এরশাদ খানকাহ সিরাজিয়া।

খানকাহ সিরাজিয়া নক্শেবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া

কুন্দিয়ান, জিলা- মিয়ানওয়ালী, পাকিস্তান

প্রকাশনায় ঃ খানকাহ সিরাজিয়া

১, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সড়ক

বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।

সকল স্বত্ব সংরক্ষিত

কিতাবের নাম ঃ ইজাহুত্ তারীকা

লেখকের নাম ঃ হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী (রহ:)

উর্দু তরজমা ঃ হযরত মাওলানা মানজুর আহমাদ সাহেব (মদীনা মুনাওয়ারাহ)

বাংলা তরজমা ঃ এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্শী

নির্দেশক্রমে প্রকাশ ঃ শায়খুল মাশায়েখ কেবলা হযরত মাওলানা আবুল খলীল খান মোহাম্মাদ সাহেব মাদ্দাজিল্লুহুল আলী

প্রকাশক ঃ খানকাহ সিরাজিয়া নকশেবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া

কুন্দিয়ান, জিলা-মিয়ানওয়ালী

প্রকাশের তারিখ ঃ জুলাই ২০০৯

খানকাহ সিরাজিয়া নকশেবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া
কুন্দিয়ান, জিলা-মিয়ানওয়ালী, পাকিস্তান।

সূচী পত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	হযরত মাওলানা সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ আলমারুফ বশাহ গোলাম আলী দেহলভী (রহঃ)	০৫
২।	এরশাদাত	০৬
৩।	কারামাত	১১
৪।	বেছাল শরীফ	১১
৫।	প্রথম অংশ ঃ রিসালায়ে সাবয়ে সাইয়্যারাহ	১৩
৬।	বয়আত ও বয়আতের শ্রেণীভেদ	১৪
৭।	পীরের পরিচয়	১৫
৮।	মুরীদের পরিচয়	১৬
৯।	সেমা	১৭
১০।	জিকরে জেহের	১৭
১১।	ওয়াহ্‌দাতে ওয়াজুদ ও শুহুদ	১৮
১২।	দরবেশী কানায়াত	১৮
১৩।	তৌহিদে আফয়ালী	১৮
১৪।	এজাজত ও খেলাফত	১৮
১৫।	নামায বা জমায়াত	১৯
১৬।	রোজা	২০
১৭।	ইজাহুত তারীকাহ	২২
১৮।	বুনিয়াদী অসুল তরীকায়ে নকশেবন্দিয়া	২৪
১৯।	তরীকায়ে জিকরে ইসমেজাত	২৪
২০।	তরীকায়ে জিকরে নফী ও ইসবাত	২৫
২১।	দ্বিতীয় তরীকা ঃ মোরাকাবা	২৭
২২।	তৃতীয় তরীকা ঃ রাবেতায়ে শায়খ	২৭
২৩।	সোহবতে শায়খে কামেল	২৭
২৪।	জিকর ঃ তাহলীলে লেছানী	২৮
২৫।	দাওয়ামে হুযুর	২৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
২৬। বেলায়েতে ছোগরা ঃ মোরাকাবায়ে মা'ইয়াত	৩০
২৭। ফানায়ে কাল্‌ব	৩১
২৮। ফানায়ে নাফস ও কামালাতে বেলায়েতে কুবরা	৩২
২৯। মোরাকাবা আকরাবিয়াত হযরতে জাত	৩২
৩০। মোরাকাবায়ে ইসমে জাহের ইসমে বাতেন	৩৪
৩১। মোরাকাবায়ে কামালাতে নবুওত	৩৪
৩২। মোরাকাবায়ে কামালাতে রিসালাত ও কামালাতে উলুল আজম ও হাকায়েকে সাবআ	৩৫
৩৩। মোরাকাবায়ে হাকীকতে কাবা, হাকিকতে কুরআন মজীদ, হাকিকতে সালাত	৩৫
৩৪। মোরাকাবায়ে মাবুদিয়াতে ছারফা ও হাকিকতে ইব্রাহিমী	৩৬
৩৫। মোরাকাবায়ে হাকিকতে মূসাভী	৩৬
৩৬। মোরাকাবায়ে হাকিকতে মোহাম্মাদী	৩৬
৩৭। মোরাকাবায়ে হাকিকতে আহমাদী	৩৬
৩৮। মোরাকাবায়ে হুব্বে ছরফ ও লা তায়াইয়্যুন	৩৭
৩৯। দরবেশী	৩৯
৪০। হাসেলে সায়ের ও সুলুক	৪০
৪১। রুয়াতে বারী তাআলা ও যিয়ারতে আঁ হযরত (সা.)	৪৩
৪২। হাকীকতে ফানা ও বাকা	৪৫
৪৩। এদরাকে বাতেন আহলুল্লাহ	৪৫
৪৪। মামুলাত ও জরুরী নসিহত	৪৭
৪৫। খাজা আবদুল খালেক গেজদেওয়ানী-এর নসিহত	৪৯
৪৬। হযরত ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফে সানীর আহওয়াল	৫০

সংক্ষিপ্ত হালাত

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ আল্ মারূফ বাশাহ্ গোলাম আলী দেহলভী (রাহঃ)

তাঁর বাতেনী নেছবত বা রূহানী সম্পর্ক ছিল হযরত মির্জা মাযহার জানেজানান্ শহীদ (রাহঃ)-এর সাথে। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১১৫৮ হিজরীতে হিন্দুস্তানের পাঞ্জাব এলাকার বাটালা নামক স্থানে। তাঁর বংশ লতিকা হযরত আলী মোরতাজা কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সাথে মিলিত হয়। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত শাহ আবদুল লতিফ অত্যন্ত জাকের ও মুজাহেদ বুযুর্গ ছিলেন। তিনি করলা সিদ্ধ করে ভক্ষণ করতেন এবং জঙ্গলে গমন করে উচ্চঃস্বরে জিকির করতেন। তিনি হযরত নাসির উদ্দিন কুদ্দেসা সিররুহুর মুরীদ ছিলেন। তাঁর জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি বলছেনঃ তোমার ছেলের নাম 'আলী' রাখবে। সুতরাং জন্মের পর তাঁর নাম আলী রাখা হয়। কিন্তু যখন তিনি সাবালকত্ব অর্জন করলেন, তখন তিনি সম্মানার্থে নিজের নাম 'গোলাম আলী' রাখেন। অনুরূপভাবে তার পয়দায়েশের সময় তাঁর মাতা কোন এক বুযুর্গকে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি বলছেন ঃ তোমার ছেলের নাম আবদুল কাদের রাখবে। এই বুযুর্গ হযরত গাওসুল আজম সাইয়্যেদ আবদুল কাদের জিলানী (রাহঃ) ছিলেন। তাঁর মামাও ছিলেন অত্যন্ত বুযুর্গ ব্যক্তি। তিনি এক মাসে কুরআন হেফজ করেছিলেন। তিনি জনাব রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশক্রমে তাঁর নাম রেখে ছিলেন 'আবদুল্লাহ'। তাঁর পিতা দিল্লীতে বসবাস করতেন। সেখানে স্বীয় পীরের সাথে যিনি খিজির (আঃ)-এর সাহচর্য ধন্য ছিলেন বয়আত করানোর জন্য ডেকে এনেছিলেন। কিন্তু সেখান হতে ফয়েজ অর্জন করা ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল না। তিনি যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন তাঁর এন্তেকাল হয়েগিয়েছিল। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা বললেন ঃ আমি তোমাকে আমার পীরের নিকট বয়আত গ্রহণের জন্য ডেকে এনেছিলাম। কিন্তু তা তকদীরে ছিল না। এখন যেখানে তোমার অন্তরের প্রশান্তি লাভ হয়, সেখানে বয়আত হয়ে যাও। তিনি ১১৮০ হিজরীতে যখন তাঁর বয়স বাইশ বছর হয়েছিল, তখন হযরত মির্জা মাযহার জানে জানান (রাহঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বয়আত হওয়ার আবেদন জানালেন। হযরত মির্জা সাহেব কুদ্দেসা সিররুহু বললেন ঃ যেখানে আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করবে, সেখানেই বয়আত গ্রহণ কর, এখানে তো লবণহীন পাথর চেটে খাওয়ার ব্যাপার। তিনি বললেন- আমি এটাই চাই। হযরত মির্জা সাহেব তাঁকে অতঃপর কাদেরিয়া তরীকায় বয়আত করলেন এবং তরীকায়ে মুজাদ্দেদিয়ায় তালকীন প্রদান করলেন। তিনি দীর্ঘ পনর বছর পর্যন্ত হযরত মির্জা সাহেব কুদ্দেসা সিররুহুর খেদমতে হালকা ও মোরাকাবায় উপস্থিত ছিলেন এবং সান্নিধ্যের খোশ খবরীসহ সার্বিক এজাজত ও অনুমতি লাভ করেন।

তিনি বলেছেন ঃ প্রথম প্রথম আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলাম যে, যদি আমি তরীকায়ে নকশেবন্দিয়ার শোগল এখতিয়ার করি তবে যেন হযরত গাওসুল আজম (রাহঃ)-এর

অসন্তুষ্টির কারণ না হয়ে যায়। এ সময়ে এক রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরত গাওসুল আজম (রহঃ) একটি গৃহে তশরীফ এনেছেন এবং ইহার সম্মুখে একটি গৃহে হযরত নকশেবন্দ (রহঃ) উপস্থিত আছেন। আমার মন চাচ্ছিল যে, হযরত খাজা নকশেবন্দ (রহঃ)-এর খেদমতে হাজির হই। হযরত গাওশে পাক (রহঃ) বললেন যে, 'মাকসুদ কেবলমাত্র আল্লাহ, যাও কোন ক্ষতি নেই।' এই ঘটনার পর তিনি তরীকায়ে নকশেবন্দিয়ার প্রচারে মনোযোগী হন। শেষ পর্যন্ত এই পরিমাণ ফয়েজ তাঁর জিন্দেগীতে জারী হল যে, সম্ভবত: কোন শায়খ হতে এই পরিমাণ ফয়েজ জারী হয়ে থাকবে। হিন্দুস্তান, কাবুল, বলখ, বুখারা, আরব এবং রোম সকল স্থানে তাঁর খলীফাগণ পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তাদের দিক হতে তরীকা জারী হয়ে গিয়েছিল।

হযরত মাওলানা গোলাম মহিউদ্দিন কাসুরী স্বীয় মলফুজাতে উল্লেখ করেছেন যে, একদিন আসর নামাযের পর উপস্থিত ছিলাম। হযরত শাহ সাহেব বললেন, আল্‌হামদু লিল্লাহ! আমার ফয়েজ দূর-দূরান্তে পৌঁছে গেছে। মক্কা মোয়াজ্জমায় আমাদের বৈঠক বসে। মদীনা মুনাওয়ারায় আমাদের বৈঠক বসে। বাগদাদ শরীফ, রোম ও মাগরিবে আমাদের বৈঠক জারী আছে। তারপর মুচকি হেসে বললেন– বুখারা তো আমাদের পৈতৃক নিবাস। কোন কোন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশে, কোন কোন লোক বিভিন্ন বুযুর্গানের হুকুমে এবং কোন কোন লোক স্বয়ং স্বপ্ন দেখে হাজির হয়েছিলেন। হযরত মাওলানা খালেদ রুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইশারায় মদীনা শরীফ হতে দিল্লীতে হাজির হয়েছিলেন এবং আট/নয় মাসে এজাজত ও খেলাফতের দ্বারা সৌভাগ্যবান হয়ে স্বীয় জন্মভূমি কুর্দিস্তান রোম সাম্রাজ্যে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এতখানি গ্রহণীয় হয়েছিলেন যে, যার কোন সীমা নেই। একবার তিনি বলেছিলেন যে, এখন আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। এখন কিছুই করতে পারি না। প্রথমে তিনি শাহজাহান আবাদের মসজিদে থাকতেন। হাওজের তিক্ত পানি পান করতেন। দৈনিক দশ পারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। দশ হাজার বার নফী-ইসবাত জিকির করতেন। নেছবত এতখানি শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল যে, সমস্ত মসজিদ নূরের আলোতে সমুজ্জল হয়ে উঠত। যে গলিতে তিনি গমন করতেন, সেই গলিও আলোকিত হয়ে যেত। যদি কোন বুযুর্গের মাজারে গমন করতেন তখন সেই বুযুর্গের নেছবত নিষ্প্রভ হয়ে যেত। এরই প্রভাবে সেই বুযুর্গ বিনয় ও নম্রতার খাতিরে নিজে নিজেই নেছবতকে নিষ্প্রভ করে নিতেন।

এরশাদাত ঃ ঘোষণাবলী

তিনি বলেছেন ঃ মানুষের দু'টি সঠিক এবং দুটি জিনিস ভঙ্গুর হওয়া দরকার। দ্বীন সঠিক এবং বিশ্বাস সঠিক হতে হবে। হাত ভঙ্গুর এবং পা ভঙ্গুরে হতে হবে। তিনি আরও বলেছেন ঃ একবার হযরত মির্জা সাহেবের কাছে কোন এক ব্যক্তি আমার সম্পর্কে একথা বর্ণনা করল যে, সে জওকও শওকের প্রত্যাশী এবং কাশফ ও কারামাতের আকাঙ্খী। তিনি একথা শুনে

বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি এ সকল উপসঙ্গের প্রত্যাশী তাকে বলে দাও যে, আমাদের খানকাহ হতে চলে যাক এবং আমাদের কাছে না আসুক'। যখন এই খবর আমার কাছে পৌঁছল, আমি তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম, হুযুর কি এ কথা বলেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি পুনরায় আরজ করলাম– তারপর কি হুকুম করবেন? বললেন, এখানে লবণ বিহীন পাথর চাঁটা ছাড়া কিছুই নেই। যদি এই বেমজাকে গ্রহণ করতে পার, তাহলে অবস্থান কর। আমি আরজ করলাম, হুযুর! আমি এতেই সন্তুষ্ট আছি।

একদিন তিনি এরশাদ করলেন যে, এই নকশেবন্দিয়া তরীকায় মোজাহাদা নাই। কিন্তু 'অকুফে কলবী' অর্থাৎ নিজের খেয়াল অন্তরের দিকে এবং অন্তরের খেয়াল মহান আল্লাহ্‌র সত্তার দিকে হবে এবং পূর্বাপর বিপদগুলোর দিকে দৃষ্টি রাখবে। ইহা এভাবে কর্যকর করতে হবে যে, যখন কোন ভয় অন্তরে পয়দা হয় যে, অমুক কাজ অতীতকালে কিভাবে সম্পন্ন হয়েছিল? তখন এই ভয়কে অন্তর দ্বারা প্রতিরোধ করবে, যেন সকল ঘটনা অন্তরে উদিত না হয়। অথবা অন্তরে এই খেয়াল আসে যে, অমুক স্থানে গমন করে এই কাজটি করব এবং এই কাজে ফায়দা হবে। তবে এই খেয়ালকে তৎক্ষণাৎ প্রতিরোধ করবে। মোট কথা, আল্লাহ্‌আড়া অন্য যেকোন বস্তুর ভয় অন্তরে আসবে, এটাকে সেখানেই প্রতিরোধ করতে হবে।

তিনি বলেছেন, কলবের অবস্থাবলী সালেকের উপর ভারী বর্ষণের মত প্রকাশ পায়। আর যখন কলব হতে উর্ধারোহন করে লতিফায়ে নাফসের ভ্রমণ শুরু হয়, তখন হাল্কা বৃষ্টির মত প্রতিভাত হয়। আর যখন লতিফায়ে নাফস হতে সফর এর পরিমাণ উচ্চতর হতে থাকে, তখন নিছবত বা সম্পর্ককে অনুভব করা যায় না। এই সময়ে নিঃস্ব হওয়া ও নিথর হওয়ার ভাব বেশী হয়ে যায় এবং সম্পর্ক কুয়াশার বিন্দুর মত হয়ে যায়।

একবার কোন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আরজ করল যে, আমার জন্য কিছু লিখে দিন, তিনি এই আয়াত শরীফ লিখলেন– قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ "আল্লাহ্‌র নাম লও এবং তাদেরকে ছেড়ে দাও" এবং এর তফসীর ও ইহার নীচে এভাবে লিখে দিলেন যে, ছোট বড় সকল কাজ আল্লাহ তায়ালার উপর সোপর্দ করা চাই এবং জীবন ধারণের দুশ্চিন্তা না করা চাই এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর সম্পর্ক পরিহার করা চাই এবং নিজের সকল কাজকে আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করা চাই।

একদিন তিনি এক দরবেশকে তাওয়াজ্জু দেয়ার জন্য স্মরণ করলেন। কেউ উত্তর দিল যে সে জামে মসজিদের দিকে ভ্রমণ করতে গেছে। তিনি বললেন, এটা কেমন ফকিরী। ফকিরীর হালতে ধৈর্য-ধারণ করা অত্যাবশ্যক। আর নাফ্‌সকে বন্দী করার নামই হল ধৈর্য। তিনি বললেন, যখন আমি মোজাহাদায় মশগুল ছিলাম, তখন পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত নিজেকে হুজরার মধ্যে বন্দী করে রেখেছিলাম। না শীতকালে বাইরে আসতাম, না গরম কালে। তিনি আরও বললেন, আমার যখন সতর বছর বয়স ছিল, তখন আমি দিল্লী আগমন করেছিলাম। এখন

আমার দিল্লীতে ষাট বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, এর একদিনও জিকির, ফিকির ও মোরাকাবা ছাড়া অতিবাহিত হয়নি। এতদ্সত্ত্বেও মৃত্যুর ভয় সব সময় লেগে আছে, পূর্ণ শান্তি তখনই লাভ করব, যখন জান্নাতে প্রবেশ করব এবং নিজের কানে রাব্বুল আলামীনের আহ্বান শুনব যে, 'হে বান্দাহ! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।'

তিনি আরও বলেছেনঃ আমাদের আকাবেরে তরীকত বলেছেন যে, সিলসিলায়ে নকশেবন্দিয়ার মধ্যে শেষ প্রান্তকে প্রথম প্রান্তের শামিল করা হয়েছে। এর অর্থ অনেকেই করেছেন। সুতরাং আমি বলছি যে, শেষ প্রান্ত যদি প্রথম প্রান্তের মধ্যে শুরু হয়, তাহলে তাওয়াজ্জুহ স্থায়ী এবং আল্লাহ্র সান্নিধ্য ও কম ভীতি বা ভীতিহীনতা বুঝায়। এ বিষয়টি অন্যান্য সিলসিলায় খুবই খেয়াল করা হয়। আর নকশেবন্দিয়া তরীকায় এই অবস্থাটি শুরুতেই পয়দা হয়ে যায়।

তিনি একথাও বলেছেন যে, আমাদের নিকট শেষ প্রান্ত অন্যকিছু। সেটা হল হুজুর বা উপস্থিতির আকর্ষণ হারিয়ে যাওয়া। তিনি এও বলেছেন যে, অধিক জিকরের দ্বারা যদি সার্বক্ষণিক অন্তরের জিকির উদ্দেশ্য হয়, তবে তার মাঝে বিচ্ছিন্নতা পাওয়া যায় না। এর দ্বারা জিহ্বার জিকির মুরাদ হয় না, যা যে কোন সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এর দলীল এই আয়াত কারীমায় আছে–

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

"তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র জিকির হতে বিরত রাখতে পারে না।" কেননা ব্যবসায় বাণিজ্যে জিকির বন্ধ হয়ে যায়, অন্তরের জিকির বন্ধ হয় না। অনেক লোক অন্তরের জিকিরকে খফী বা নীরব জিকির বলেন, এটা ভুল। কেননা খফীর অর্থ হল– লুক্কায়িত বা প্রচ্ছন্ন। অন্তরের জিকির যদিও অন্যদের হতে লুক্কায়িত, কিন্তু এ সম্পর্কে ফেরেশতাগণ জানেন, এমনকি খবিছ শয়তানও তা জানে। তাই প্রকৃত লুক্কায়িত অবস্থা এর মধ্যে পাওয়া যায় না। মূলত: খফী জিকির হল- জিকিরকারী জিকিরের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া, সে নিজের ও জিকিরের খবরও রাখে না। যখনই তিনি বলেছেনঃ আমার অবস্থা এমন যে, কলবের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ হই, তখন জিকিরের প্রভাব অনুভব করি না। কিন্তু এই অবস্থাটি যখন অপসারিত হয়ে যায়, তখন অনুভূত হয় যে, প্রতিটি লোম্ কূপ হতে জিকিরজারী হচ্ছে।

তিনি আরও বলেছেন ঃ শবে কদর এক অত্যধিক বরকতময় রাত। এই রাতে দোয়া ও এবাদত মকবুল হয়। নৈকট্য লাভকারীদের এই রাতে অন্য এক অবস্থার সৃষ্টি হয়। তিনি বলেছেন: একবার আমি রাচ জামে মসজিদে ঘুমিয়েছিলাম। এতে কাফের হালত ছিল। এক ব্যক্তি এসে আমাকে জানিয়ে দিল এবং বলল, উঠুন! রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মরহুম উম্মতগণের জন্য দোয়া করুন। আমি উঠলাম এবং দেখলাম চারিদিকে শুধু নূরই নূর। আমি বুঝে ফেললাম- ইহা শবে কদরের নূর। তিনি একথাও বলেছেন যে, পীরের রেজামন্দি খালেক ও

মাখলুকের নিকট মকবুল হওয়ার কারণ এবং পীরের অসন্তুষ্টি খালেক ও মাখলুকের অসন্তুষ্টির কারণ। পীরের সন্তুষ্টির দ্বারা ঐ সকল বস্তু হাসিল হয় যা কোন রিয়াজত ও মোজাহাদার দ্বারা হাসিল হয় না। হযরত খাজা মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন (কুদ্দেসা আসরারুহুম) বলেছেন ঃ এই তরীকার মধ্যে কাজের ভিত্তি হল আল্লাহ্‌র প্রতি আজিজী ও এনকেছারী প্রকাশ করা এবং পীরের প্রতি এখলাসের সাথে আনুগত্য করা। হযরত খাজা বারদিন সেজদায় পতিত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করেছেন যে, ইলাহুল আলামীন! আমাকে এমন একটি তরীকা দান করুন, যা হবে আল্লাহ্‌র দিকে গমন করার আসান ও সহজ রাস্তা এবং অধিক নিকটের রাস্তা যা আল্লাহ্ পর্যন্ত প্রলম্বিত। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালা সুবহানাহু তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং এই তরীকা এনায়েত করলেন।

তিনি বলেছেন ঃ হযরত মির্জা সাহেবের কাছে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি এই তরীকায়ে মুজাদ্দেদিয়া কেন এখতিয়ার করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, এই তরীকায় মোটেই রিয়াজত ও মোজাহাদা নেই। আমি মির্জা ছিলাম একজন নাজুক স্বভাবের লোক। আমার দ্বারা অন্যান্য তরীকার মোজাহাদা সম্ভব ছিল না। তিনি বলেছেন ঃ আহলে মহব্বত অর্থাৎ মহব্বতধারীদের কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। তাদের জন্য আমলে কালীল অর্থাৎ স্বল্প কর্মই যথেষ্ট। বরং স্বল্প কর্মেরও প্রয়োজন হয় না। তিনি এও বলেছেন যে, নকশেবন্দিয়া তরীকা ওলামাদের নিকট পসন্দনীয়। তিনি বলেছেন ঃ যখন হযরত খাজা নকশেবন্দ (কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহু)-এর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন একজন জাহেদ তাঁর কর্মকাণ্ড ও সময় ক্ষ্যাপন দর্শন করার জন্য আগমন করল। সে তাঁকে কোন রিয়াজত ও মোজাহাদা করতে দেখল না। তিনি সহজ স্বাভাবিকভাবে নামাযসমূহ আদায় করলেন। রাতে এশার নামাযের পর পোলাও ভক্ষণ করে শুয়ে পড়লেন। রাতের তৃতীয় অংশে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করলেন। সেই জাহেদ হয়রান হয়ে গেল এবং আরজ করল যে, আমি সারারাত বিনিদ্র ছিলাম এবং জিকিরে নিমগ্ন ছিলাম। আর আপনি সন্ধ্যায় পোলাও ভক্ষণ করেছেন, রাতের বেশীর ভাগ সময় ঘুমিয়েছেন। কিন্তু যে নূর আপনার মধ্যে আছে, তা আমার মধ্যে নেই। তিনি মুচকি হেসে বললেন যে, এটা হচ্ছে সেই পোলাও-এর নূর। তারপর তিনি বললেন, অন্তরকে আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছু হতে খালি করা এবং আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার দিকে মুতাওয়াজ্জুহ থাকলে নূর হাসিল হয়। তিনি এও বললেন যে, একদিন একজন হিন্দু লোক আমার নিকট এসে বলল, আমাকে সৃষ্টিকর্তার জিকির শিখিয়ে দিন। আমি বললাম, আল্লাহ, আল্লাহ দু'হাজার বার প্রত্যহ সকালে বলবে। সে বলল, এই শব্দ দ্বারা তো জিকির করব না। আমি বললাম, আচ্ছা! কলবের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ্ হয়ে দিলে দিলে 'তুমিই তুমি, তুমিই তুমি' বলতে থাক। এ কথায় সে রাজী হয়ে গেল। কয়েকদিন পর তার অন্তরে আল্লাহর দিকের প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে গেল এবং সে মুসলমান হয়ে গেল।

তিনি এও বলেছেন যে, একজন হিন্দু আমার কাছে আসল এবং বলল, আমি দৈনিক পঞ্চাশ হাজার বার আল্লাহ আল্লাহ করি। এর বরকতে অন্য সব কিছুর প্রতি আমার অনীহা এসে গেছে। তিনি বলেন, আমি নিজের চোখে তাঁর অন্তরের অবস্থা দেখলাম। কিন্তু কুফুরীর কারণে

অবস্থা ছিল আবর্জনা পূর্ণ। ঈমানী জিকির ছাড়া নূরানী অবস্থা পয়দা হয় না। তিনি বলেন, এই হিন্দুর জন্য আমার খুবই দুশ্চিন্তা হল যে, কুফুরীর অন্ধকার সত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে গাফেল হয় না। আর আমি নূরে ঈমান থাকা সত্ত্বেও গাফেল হয়েছি। (এ কথাটি তিনি নফসকে অবদমিত করার জন্য বলেছিলেন।)

তিনি বলেছেন, অবস্থার প্রত্যাশী আল্লাহ্‌র এবাদতকারী নয়। জিকির করতেই হবে। চাই কাইফিয়াত বা অবস্থা পয়দা হোক বা না হোক। জিকির আদতেই ইবাদত। তিনি আরও বলেছেন, প্রতিদিন অন্তরে অন্তরে পঁচিশ হাজার বার জিকরে ইসমেজাত আল্লাহ, আল্লাহ, করা জরুরী। তিনি বলেছেন, বাতেনী স্থিরতার সংজ্ঞা এই যে, আগে এবং পরের দুশ্চিন্তা যেন অন্তরে না আসে। তিনি বলেছেন, অন্তরের প্রত্যাশা হতে বিমুক্ত হওয়াকে ফকীর বলা হয়, হাত কপর্দকহীন হওয়াকে নয়। তিনি বলেছেন, মানছুর পা পিছলে পড়ে গেছে। সে যুগে এমন কেউ ছিল না, যে তাঁর সাহায্য করবে। যদি আমার যুগে হত, তাহলে আমি তাকে সাহায্য করতাম। এই অবস্থা হতে নিষ্কৃতি দিয়ে উচ্চতর মাকামে নিয়ে যেতাম।

তিনি বলেছেন, তরবিয়ত বা শিক্ষাদানের প্রকার হচ্ছে দুটি। তরবিয়তে জামালী এবং তরবিয়তে জালালী। তরবিয়তে জামালীর দ্বারা সবকিছুই অনুগত থাকে। এটা নাফসের অনুকুল। কিন্তু তরবিয়তে জালালীর উপর কায়েম থাকা খুবই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার এবং দ্বীনদার বীরের কাজ। তিনি বলেছেন, প্রকৃত সন্তুষ্টি পরিপূর্ণ ফানা বা বিলীন হওয়া ব্যতীত হাসিল হয় না। এ কারণে এ কথার উপর ঐক্যমত্য হয়েছে যে, রেজা বা সন্তুষ্টি আখেরাতের মাকামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। তিনি বলেছেন, এই যুগে তাসফিয়ায়ে কলবের উদ্দেশ্যে ওলী আল্লাহগণের স্মরণের কিতাব অধ্যয়ন করা হতে উত্তম কোন আমল নেই। আমার পীর আমাকে দুটি নসীহত করেছেন, একটি এই যে, মানুষের আয়েব বা ত্রুটিকে পুণ্যের দিকে বিশ্লেষণ করা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই যে নিজের পুণ্যকে ত্রুটির দিকে ব্যাখ্যা করা। আমি আরজ করলাম- এতে তো ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি বললেন, আমার কাছে তো কাউকেই এমন মনে হয় না যে, তাকে পুণ্য কর্মের নির্দেশ দেয়া যায়। আমি প্রত্যেককে ভালো বলেই জানি শায়খ সা'দী সিরাজী বলেছেন–

مرا پیر دانائے مرشد شہاب
دو اندرز فرمود بر روئے آب
یکے آنکہ بر خویش خود بین مباش
دوم آنکہ بر غیر بد بین مباش

অর্থাৎ আমাকে আমার জ্ঞানী পীর হযরত শায়খুশ্ শুয়ুখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী সমুদ্রের মধ্যে আমাকে দু'টি নসীহত করেছেন। একটি এই যে, আত্ম-গরীমা সম্পন্ন হয়ো না। আর দ্বিতীয়টি এই যে, অন্যের প্রতি খারাপ দৃষ্টি ও অপমান সূলভ মনোভাব না রাখা।

কারামাত ঃ

একদিন এক হিন্দু ব্রাহ্মণের এক সুন্দর ছেলে হঠাৎ করে মজলিস শরীফে এসে হাজির হল। সকলেই সেই ছেলেটির দিকে তাকাতে লাগল। শায়খের করুণার দৃষ্টি তার উপর পতিত হল। ছেলেটি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল।

একজন পুণ্যবতী বৃদ্ধা মহিলার যুবক ছেলের মৃত্যু হল। শায়খ তার জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করার জন্য তাশরীফ নিলেন। জানাযার নামাযের প্রাক্কালে তিনি বললেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তোমাকে উত্তম বিনিময় ফরজন্দ দান করুন। মহিলাটি বলল, হযরত আমি এখন দুর্বল বৃদ্ধা হয়ে গেছি। আমার স্বামীও বৃদ্ধ ও দুর্বল। এমতাবস্থায় আমাদের সন্তান কেমন করে হবে? শায়খ বললেন, আল্লাহ তায়ালা শক্তিশালী। তারপর তিনি সেখান হতে গাত্রোত্থান করে একটি মসজিদে তাশরীফ আনয়ন করলেন। অজু করলেন এবং দু'রাকায়াত নামায আদায় করলেন এবং সেই মহিলাকে সন্তান দান করার জন্য দোয়া করলেন। দোয়া করার পর তিনি সহযাত্রীদের লক্ষ্য করে বললেন, সেই মহিলাকে সন্তান দানের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলাম। দোয়া কবুলের নিদর্শন পেয়েছি। ইনশাআল্লাহ তায়ালা ছেলে সন্তান পয়দা হবে। হযরতের এই খোশ-খবরী মোতাবেক করুণাময় আল্লাহ্ তাকে একটি ছেলে সন্তান দান করলেন। ছেলেটি যুবক হয়ে উঠল।

একদা এক ব্যক্তি হযরতের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল– আমার ছেলেটি একমাস যাবত হারিয়ে গেছে। আপনি দোয়া করুন, হযরত বললেন, ছেলেটি তো তোমার ঘরেই আছে। লোকটি একথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল যে, আমি এইমাত্র ঘর থেকে এসেছি। যাই হোক, সে হযরতের ফরমান মোতাবেক ঘরে ফিরে এসে দেখল, সত্যিই ছেলেটি ঘরে ফিরে এসেছে।

বেছাল শরীফ বা মৃত্যু ঃ

যখন মৃত্যু রোগ শুরু হল, তখন সর্দি-কাশি ও খোশ-পাঁচড়া ব্যাপক হয়ে দেখা দিল। তাঁর অধিক অভ্যাস ছিল যে, অসুখের সময় অধিক হারে তিনি ওসীয়তনামা লিখতেন এবং সর্বদা জিকির করা, নেছবত বা সম্পর্ক অব্যাহত রাখা, সচ্চরিত্র গঠন করা, উত্তম ব্যবহার করা, ফয়েজ জারী হওয়া সম্পর্কে উচ্চ-বাচ্য না করা, মুসলমান ও বেরাদরানে তরীকতের মধ্যে একতা বজায় রাখা, দারিদ্র বরণ করে নেয়া, স্বল্পে তুষ্ট থাকা, তাওয়াক্কুল ও তাসলীম এবং রেজা অব্যাহত রাখার নসীহত মুখে করতেন। তিনি বলেছেন ঃ হযরত খাজা নকশেবন্দ বলেছিলেন যে, আমার জানাযার সামনে ফাতেহা অথবা কোন আয়াত শরীফ অথবা কালেমায়ে ত্বাইয়্যেবা যেন না পড়া হয়। এটা বেআদবী হবে। বরং এই দুই লাইন কবিতা পাঠ করবে ঃ

مفلسانیم آمدہ درکوئے تو ☆ شیئاً للہ از جمال زوئے تو
بت بکشا جانب زنبین ما ☆ آفریں بردست وبر بازوئے تو

আমি কপর্দকহীন, আপনার অঙ্গনে এসেছি, আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার সমুজ্জ্বল চেহারার একটি ঝলক দেখিয়ে দিন। আমার থলিয়ার দিকে আপনার অনুগ্রহের হাত বাড়িয়ে দিন। আপনার হাত ও বাহুর উপর শত শত দান সঞ্চিত আছে।

وفدت على الكريم بغير زاد ☆ من الحسنات والقلب السليم
فحمل الزاد اقبح كل شيء ☆ اذا كان الوفود على الكريم

আমি আমার দয়ালু পরওয়ারদিগারের দিকে কোন সম্বল ছাড়াই পথ চলেছি। আমার কছে কোন পুণ্য ও নেকী নেই, এবং প্রশান্ত অন্তরও নেই। সম্বল বহন করা ঐ অবস্থায় যখন আল্লাহ্ তায়ালার উপর পরিপূর্ণ ভরসা করা দরকার, সব জিনিসের নিকটই অপছন্দনীয়।

২২শে সফর, ১২৪০ হিজরী শনিবার দিন তিনি এন্তেকাল করেছেন। তাঁর জানাযার নামায দিল্লীর মসজিদে শাহ আবু সাঈদ পড়িয়েছেন এবং হযরত মির্জা মাজহার জান জানান শহীদ-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

প্রথম অংশ

সাত তারকা পুস্তিকা

বয়আতের শ্রেণীভেদ, পীরি ও মুরিদীর শর্তাবলী। মুরীদগণের মধ্যে মুর্শেদগণের নিদর্শনাবলীর প্রভাব। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর উত্তম স্মরণ। এক অলীর উপর অপর অলীর ফজিলত (দলীল-প্রমান ছাড়া) না দেয়া। ছেমা ও গানের সীমারেখা। দরবেশী ও কারামাতসূলভ জিন্দেগী। তৌহিদের শ্রেণীভেদ। মুর্শিদের পক্ষ হতে মুরীদের এজাজত লাভ ও স্থলাভিসিক্ত হওয়া। বেদআতসমূহ (অর্থাৎ নিজের দিক হতে দ্বীনের কথা বানানো) শরীয়ত বহির্ভূত বিষয়াদি এবং কাফেরদের চালচলন সংক্রান্ত আলোচনা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রথম অংশ

॥ সাত তারকা পুস্তিকা ॥

বয়আত ও বয়আতের শ্রেণীভেদ ঃ

আল্লাহপাক জাল্লা জালালুহুর হামদ ও সানা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণের পর ফকীর আবদুল্লাহ ওরফে গোলাম আলী কাদেরী নকশেবন্দী, মুজাদ্দেদী উফিয়া আনহু গোজারেশ করছে যে, জানা থাকা আবশ্যক যে, বয়আতের অর্থ হচ্ছে ওয়াদা ও অঙ্গীকার করা। তারপর এর উপর মজবুতী ও পাবন্দীর সাথে সুদৃঢ় থাকা। বয়আত করা সুফিয়ায়ে কেরাম (রাহঃ)-এর নিকট গৃহীত ও বিধিবদ্ধ আমল এবং ইহা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর সুন্নাত তরীকা।

বয়আত তিন প্রকার। প্রথম প্রকার এই যে, ব্যক্তি কোনও বুযুর্গের হাতে গোনাহের কাজ পরিত্যাগের জন্য তাওবাহ করবে। (এই শ্রেণীর বয়আতের হুকুম এই যে) সে গোনাহে কবীরা হতে ফিরে যায়। তার উচিত দ্বিতীয় বার বয়আত করা। গীবত অর্থাৎ অনুপস্থিতিতে কারও দোষ বর্ণনা করার মধ্যে এখতেলাফ আছে যে, ইহা গোনাহে কবীরা কিনা। অবশ্য কোন মুসলমানের ইজ্জত হানি করা, বদনামী করা এবং লজ্জিত করার জন্য যে গীবত করা হয়, ইহা গেনাহে কবীরা হওয়াতে কোনও সন্দেহ নেই।

(এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা চাই যে) যে সকল আশাতেজা ও ওলামার এলমী দক্ষতা এবং পারদর্শিতার কমী হয় (অর্থাৎ তাদের কোন কোন কথা দুর্বল হয়) অনুরূপভাবে সেই পীর-ফকীর যে নিজের দিক থেকে কথা বানায় এবং সুফিয়ায়ে কেরামের আসল নীতি পরিহার করে, তাদের সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার জন্য কথা-বার্তা বলবে, যাতে করে মানুষ তাদের খপ্পর হতে বাঁচতে পারে। তাহলে একাজকে গীবত বলে গণ্য করা যাবে না।

দ্বিতীয় প্রকার এই খেয়ালে বয়আত গ্রহণ করা যে, বুযুর্গদের কোনও খান্দানের (গোত্র) সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেন তার সকল খোশ-খবরী হাসিল হয়ে যায় যা সে খান্দানের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। আর এই সম্পর্কের কারণে যেন সুপারিশ লাভে সক্ষম হয়। যেমন কাদেরী সিলসিলায় বয়আত হওয়া। যেন গাউসুস্ সাকালাইন হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর খোশ-খবরী লাভের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি বলেছেন যে, আমার সিলসিলার মুরীদগণ তাওবাহ ছাড়া মৃত্যুবরণ করবে না। (এই বয়আতের হুকুম এই যে, সে গোনাহে কবিরার দ্বারস্থ হয় না, সুতরাং) এই বয়আত দ্বিতীয়বার করার প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় প্রকার হচ্ছে ঐ বয়আত যা কোনও খান্দান হতে উপকার লাভের প্রত্যাশায় করা যায়। তবে যদি সেই ব্যক্তি সে খান্দান সংশ্লিষ্ট জিকির ও ওজীফা সমূহ এবং এখলাসের পর্যায়সমূহ (অর্থাৎ সেই বুযুর্গদের জিকির ফিকিরের নির্দিষ্ট পন্থা) গ্রহণ করে এবং কোন কিছু নাগালের মধ্যে না আসে, তবে তার জন্য সত্যতার সাথে তালাশ করা জরুরী যে, কোন অন্য বুযুর্গদের খান্দানের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা এবং অন্য মোর্শেদের হাতে বয়আত গ্রহণ করা। চাই প্রথম মোর্শেদের সন্তুষ্টি থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু তাঁর বুযুর্গীকে অস্বীকার করতে নেই। বরং এই খেয়াল করবে যে, আমার কিসমত সেখানে ছিল না। আর যদি মুরীদ স্বীয় মোর্শেদকে শরীয়তের পাবন্দী এবং তরীকতের নীতি ও আদর্শে দুর্বলতা ও শৈথিল্য প্রদর্শনকারী পায়, দুনিয়াদার এবং দুনিয়ার মহব্বতে আকৃষ্ট পায়, তাহলে তার উচিত অন্য মোর্শেদের নিকট হতে বাতেনী ফয়েজ এবং মহব্বত ও মারেফাত হাসিল করা।

মাস্‌য়ালা ঃ যদি কোন নাবালেগ বাচ্চা কারও প্রেরণায় কোন মোর্শেদের হাতে বয়আত গ্রহণ করে, তবে জ্ঞান-বুদ্ধির বয়সে উপনীতি হওয়ার পর তার স্বাধীনতা থাকবে যে, যেখানে ইচ্ছা কোনও মোর্শেদের নিকট বয়আত গ্রহণ করবে। অথবা প্রথম মোর্শেদের বয়আতের উপর কায়েম থাকবে। এই শর্তে যে, তিনি যদি মোর্শেদে কামেল হন।

পীরের পরিচয় ঃ

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রে পীর তাকেই বলা হয়, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নাতের পাবন্দ হন এবং যার আঁচল বিদআতের দাগে রঞ্জিত না হয়। যিনি বুযুর্গানে দ্বীন যেমন গাউসুস্ সাকালাইন আবদুল কাদের জিলানী এবং শায়খুস ইসলাম গঞ্জে শাকর (রাহঃ)-এর আকীদার উপর কায়েম হবেন। একই সাথে ফিকাহ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় মাসায়েল সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং তিনি মেশকাত শরীফের হাদীস সমূহ এবং কুরআনুল কারীমের তফসীর অধ্যয়ন করবেন। এতদসত্ত্বেও সুফীয়ায়ে কেরামের নৈতিক কিতাবাদি যেমন ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর 'মিনহাজুল্ আবেদীন' এবং 'কিমিয়ায়ে সায়াদাত' অধ্যয়ন করবেন। এমনিভাবে বুযুর্গদের বাতেনী আহওয়াল এবং মলফুজাতের কিতাবাদিও নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করলে তা অন্তর এবং নাফসের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট উপকারী হবে। দুনিয়া এবং বিশ্ববাসী হতে পৃথক থাকাকে এখতিয়ার করবেন এবং নিজের সময়গুলোকে সার্থক করার জন্য নেক আমলের পাবন্দি এবং নির্জনতা ও দূরে থাকাকে এখতিয়ার করবেন।

তিনি আল্লাহ্‌র রেজামন্দির প্রত্যাশা এবং মাখলুক হতে বিমুখ হওয়াকে নিজের স্বভাবে পরিণত করবেন। যদি কুরআন পাক হেফজ করা কঠিন হয় তাহলে কুরআন পাকের কিছু অংশ তিলাওয়াত করতে থাকবেন এবং অধিক জিকিরের মাধ্যমে বাতেনী অবস্থাবলী ও বরকত সমূহ হতে উপকৃত হতে থাকবেন। একই সাথে তাওবাহ, এনাবত, যোহ্‌দ, ওয়ারা, তাকওয়া, ছবর, কানায়াত, তাওয়াক্কুল, তাসলীম এবং রেজা-কে নিজের স্বভাবে পরিণত করবেন। এমন

মোর্শেদকে দর্শন করলে আল্লাহ্ সুবহানাহু স্মরণে আসবে এবং নিজের অন্তরকে ভুল ইচ্ছাসমূহ হতে বিমুক্ত পাবে।

যদি মোর্শেদ চিশতিয়া সিলসিলার হন, তবে তাঁর সোহবত ও ফয়েজের দ্বারা আগ্রহ, উদ্দীপনা এবং অন্তরে আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার সীমাহীন মহব্বত এবং দুনিয়া ও বিশ্ববাসীর থেকে বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্ব হাসিল হবে।

আর যদি সিলসিলায়ে কাদেরিয়ার হন, তাহলে অন্তরের পবিত্রতা, আলমে আরওয়াহ এবং ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্ক এবং অতীত ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন বিষয়াবলী প্রতিভাত হওয়া সহজতর হয়।

আর যদি নকশেবন্দী বুযুর্গদের হন, তাহলে তাঁর সোহবতে হুযুর অর্থাৎ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ধারাবাহিক স্মরণ, জামইয়াত অর্থাৎ কলবের প্রশান্তি, স্মরণ রাখার সম্পর্ক এবং বেখুদী অর্থাৎ নিজের এবং মাখলুক হতে বেপরোয়া হওয়া এবং জাজবাত অর্থাৎ জোশ ও খারুশ, এরাদাত ও এন্‌কেশাফাত হাসিল হবে।

আর যদি বুযুর্গানে মুজাদ্দেদিয়ার হন, তাহলে উপরের জগতের লতিফাসমূহে সে অবস্থাবলী, অন্তরের পবিত্রতা, বাতেনী সম্পর্কের লতিফা সমূহ এবং সেই আনওয়ার ও গোপন রহস্যাবলী যা সিলসিলায়ে মুজাদ্দেদীয়ায় বিদ্যমান আছে, তা হাসিল হয়ে যাবে। আর যদি মোর্শেদের সোহবতে এই বস্তুগুলো হাসিল না হয়, তাহলে একথা বলা নিরর্থক হবে না যে-

صحبت نیکاں ز جہاں دور گشت
خانہ عسل خانہ زنبور گشت

পুণ্যবানদের সোহবত দুনিয়া হতে উঠে গেছে এবং মধুর চাক ভিমরুলের চাকে পরিণত হয়েছে।

মুরীদের পরিচয় ঃ

মুরীদ সেই ব্যক্তি, যার অন্তরে আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে আকাঙ্খার আগুন জ্বলে উঠে এবং আল্লাহ্ পাকের অধিক মহব্বত তাকে আত্মহারা করে দেয়। যে তাহাজ্জুদ গুজার এবং বিরহে যার চোখ অশ্রু বর্ষণকারী। যার চিহ্ন হচ্ছে নম্রতা, কোমলতা এবং অতীত কর্মের লজ্জা ও অনুশোচনা এবং ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌র ভয়ই তার কর্ম প্রবাহ। দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও নম্রতা যার সহজাত স্বভাব। যে কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত এবং নিজের সময়কে নেক আমলের কাজে বিন্যাস করে, দুর্ভাবনা ও দুর্ঘটনা এবং বিপদের সময় ধৈর্য, সাহস ও অনুকম্পাসহ আল্লাহ পাকের তাকদীরের উপর পরিতুষ্ট থাকে।

সে সর্বদা নিজের অক্ষমতার কথা স্বীকার করে এবং মাখলুককে নির্দোষ মনে করে এবং প্রতি নিঃশ্বাসে আল্লাহ তায়ালার স্মরণে বিভোর থাকে, যেন এটাই তার শেষ নিঃশ্বাস। আর সে অসতর্কতা হতে বিমুক্ত থাকে। আর সাধারণ কথাবার্তায় যুদ্ধ, ঝগড়া, কটুকথা ও প্রতিপক্ষের প্রতি অভিযোগ আরোপ করা হতে বেঁচে থাকে। এমন যেন না হয় যে, কারও অন্তরে আঘাত লাগে। কেননা অন্তর হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার ঘর। সাহাবায়ে কেরামের কথা সম্মানের সাথে স্মরণ করবে, বরং হাদীসের দৃষ্টিতে (সাহাবায়ে কেরামের মতপার্থক্য সম্পর্কে) নীরবতা অবলম্বন করবে। যেন সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কিছু বলা হতে দূরে থাকতে পারে। যদি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ নাও থাকে, তবুও তারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। সুতরাং তাদের ছাড়া অন্যদের নিকট ভালো আর কি আসা করা যেতে পারে? যেহেতু তাদের বন্ধুত্ব আল্লাহ্ পাকের হাবীব (সাঃ)-এর সাথে সংযুক্ত।

আর আউলিয়ায়ে কেরামকে নিজের ধারণা মোতাবেক একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদা দিবে না। কেননা, কাউকে মর্যাদা দেয়া কুরআন, সুন্নাত এবং সাহাবাদের ঐক্যমত্য অনুসারে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অন্য কারও মহব্বত এবং অনুরাগের কোনই মূল্য নেই।

সেমা (سماع)

বুযুর্গদের থেকে বাদ্যযন্ত্র এবং মহিলা ও খুবছুরত নবীন ছেলেদের ও অনুপযুক্ত লোকদের ব্যতীত সেমা বা গজল শোনার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত সুলতানুল মাশায়েখ-এর মাহফিলে খেলাফে শরীয়ত কোন পদচারণা হতে পারত না। যদি কিছু দেখা যেত, সেটা হত কান্নাকাটি ও অন্তরের রোদন। যেমন ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ এবং সিয়ারুল আউলিয়া কিতাবে বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান আছে।

বুযুর্গদের দিক নির্দেশনার খেলাফ কাজ করা অন্তরকে নূরহীন (অন্ধকার) করে দেয়। স্বল্প পরিমাণ সেমা অন্তরের কাঠিন্যতা ও অন্তরের পেরেশানী দূর করে সম্প্রসারণশীলতা আনয়ন করে এবং বেদনা ও জ্বালা বর্ধিত করে। সুখ ও তৃপ্তি লাভের জন্য যে সকল (আল্লাহ্র) মহব্বতের কবিতা শ্রবণ করা সম্ভব হয় তা অন্তরের কোমলতার কারণ হয়। কোন কোন বুযুর্গ একটি সম্পর্কের কারণে সেমাকে বৈধ বলেছেন। কিন্তু তা গাফলতের মাহফিল সাজানোর জন্য জায়েয নয়। উল্লিখিত শর্তসমূহ ব্যতীত সেবা ফাছেকী ও পাপ কর্মের অন্তর্ভূক্ত। খবরদার, এরূপ পরিস্থিতি হতে দূরে থাকা আবশ্যক। যদি কোন সুফী গান-বাজনাকে এমনিতেই যায়েজ মনে করে থাকলে তা হবে তার আবেগের প্রতি দুর্বলতা। শরীয়তের বিধান মোতাবেক তার অনুসরণ করা দুরস্ত নয়।

উচ্চঃস্বরে জিকির করা ঃ

অন্তরের চিকিৎসার জন্য উচ্চঃস্বরে জিকির করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু নিঃশব্দে অর্থাৎ খফী জিকিরই উত্তম। কেননা, খফী জিকির সব সময় হতে পারে। হাদীস শরীফের আলোকে

জিকরে খফীর মার্যাদা জিকরে জলী হতে অধিক বলে স্বীকৃত। অন্তরে উত্তাপ পয়দা করা এবং অলসতা দূর করার জন্য জিকরে জলী মধ্যম স্বরে করা দূরস্ত আছে।

ওয়াহদাতে ওয়াজুদ এবং শুহুদ ঃ

অধিক মহব্বতের কারণে যে অধিক পরিমাণে জিকির ও রিয়াজত অর্জিত হয়, এতে আল্লাহ্‌র তৌহিদের গোপন রহস্যাবলী ও ভেদসমূহ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং সে সকল মাখলুকাতের মধ্যে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌কেই প্রত্যক্ষ করে, কোন মাখলুককে নয়। আল্লাহ্ পাকের সাথে এক বরাবর মনে করা এবং নিজের খেয়াল ও ধারণার মাধ্যমে আত্মহারা বিভোর বুযুর্গদের অনুসরণে মুখে কিছু উচ্চারণ করা এবং নিজেকে একেশ্বরবাদী মনে করা জ্ঞান ও শরীয়তের দৃষ্টিতে এক নয়। হযরত রোকনুদ্দিন আবুল মাকারেম আলাউদ্দৌলা সামনাঈ এবং ইমাম মুজাদ্দেদে আলফেসানী এবং তার অনুসরণকারীগণ দেখেছেন এবং পেয়েছেন। অর্থাৎ গোপন রহস্যাবলী (তাদের কাছে) সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এমন একটি মারেফাত চলমান মারেফাত ছাড়াও হাসিল হয়েছে, যা আম্বিয়া (আঃ)-এর মন ও মেজাজের অনুকুল।

দরবেশী ও স্বল্পে পরিতুষ্টি ঃ

সর্বদা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা, সচ্চরিত্রতা ও শরীয়তের পাবন্দী করা এবং তার অন্তর গায়রুল্লাহ হতে শূন্য হয়ে যায় এবং তার চাল-চলন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুসরণের মাধ্যমে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় এবং প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহ্‌র দিকে অনুরাগী থাকা এবং সর্বদা তার চোখের সামনে আল্লাহ্‌র সত্তা বিরাজিত থাকা প্রতিভাত হয়। যাকে এহসানের মর্যাদা বলা হয়, তা তার অন্তরের আবশ্যকীয় গুণে পরিণত হওয়া একটি বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। যদি আল্লাহ্ পাক তা দান করেন এবং তা হতে বঞ্চিত না করেন।

তৌহিদে আফয়ালী ঃ

তৌহিদে আফয়ালী হচ্ছে সকল কাজকে একমাত্র কর্মকর্তার কর্ম বলে স্বীকার করা। তৌহিদে সিফাতী হচ্ছে এই যে, সকল মাখলুকাতের গুণাবলীকে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর ছায়া বলে মনে করা। আর তৌহিদে জাতী এর নির্যাস হচ্ছে এই যে, সকল সত্তাকে একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তায় বিভোর পাওয়া। যেমন আওলিয়ায়ে কেরাম হতে বর্ণিত হয়েছে। কাব্য কথায় আছে "সেই মহব্বতের দাবীদারের প্রতি আশ্চর্য হতে হয়, যে একজনকে মাহবুব করেছে অথচ অন্যের সাথে মহব্বত রাখে।"

এজাজত এবং খেলাফত ঃ

যখন কোন মুরীদ নিজের দিক হতে পরিপূর্ণ নেছবত বা সম্পর্ক স্থাপন করে বাতেনী অবস্থাসমূহ অর্থাৎ সুলুকের পথের মঞ্জিলগুলো অতিক্রম করে এবং স্বীয় আখলাক ও স্বভাবকে শোধরে নেয় এবং ধৈর্য, তাওয়াক্কুল, রেজা, তাসলীম এবং দুনিয়া পরিত্যাগী মনোভাব

এখতিয়ার করে এবং এই বুলন্দ মর্তবার উপর সলফে সালেহীনের অনুসরণে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তাহলে এই মুরীদ খেলাফত ও এজাজতের হকদার হয়ে যায়। বাতেনের অবস্থাবলী ও স্বভাবগুলো হাসিল হওয়া ছাড়া শুধু কেবল অজীফা কালামের তালকীন করলে এজাজত দেওয়া হারাম। বুযুর্গদের মশহুর তরীকার বিপরীতে কাউকে খেলাফত দিয়ে অহংকারী করা এবং অন্যকে বঞ্চিত করে নিরাশ করে দেয়া জ্ঞান ও শরীয়ত বহির্ভূত কাজ।

আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে এবং জীবন বরবাদ করা এই বৃদ্ধকে স্বীয় রেজামন্দি এবং আপন হাবীব রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সন্তুষ্টি দান করুন এবং স্বীয় দীদারের প্রতি আসক্ত করুন। কাব্য কথায় বলা হয়েছে ঃ

"হে আমার মাওলা! হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর আওলাদগণের ওছিলায় আমার যেন ঈমানের সাথে মৃত্যু হয়। যদি তুমি আমার দোয়া কবুল কর অথবা না কর, কিন্তু আমার হাত হতে আলে রাসূলগণের আঁচল যেন ছুটে না যায়।"

জমাতসহ নামায আদায় ঃ

জমাতসহ নামায আদায়ে রুকূ, সেজদাহ, কাওমাহ ও জলছা বা বৈঠকে শান্তি ও আন্তরিকতা থাকা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হতে প্রমাণিত আছে। কোন কোন ওলামা 'তাদিলে আরকান' (ফরজসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা) কে ফরজ বলে উল্লেখ করেছেন। হানাফী মুফতীদের মধ্যে কাজী খান ওয়াজিব লিখেছেন। তা ছুটে গেলে সোহো সেজদা ওয়াজিব লিখেছেন। আর যদি ইচ্ছা করে ছেড়ে দেয়, তাহলে পুনরায় নামায পড়ার মত প্রদান করেছেন। যে সকল ফোকাহা তাদিলে আরকানকে সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ বলেছেন, তাদের কথা ওয়াজিবের নিকটবর্তী। সুন্নাতকে মামুলী ও নিকৃষ্ট মনে করা কুফুরী। দাড়ানোর অবস্থা এবং খুশু এবং খুজু পৃথক জিনিস। রুকু, সেজদাহ, জলছা, বসার অবস্থা এবং আন্তরিকতা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

নামায সকল এবাদতের সমষ্টি। যেমন কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত, তাসবীহ, দরূদ, এস্তেগফার এবং দোয়া সম্বলিত। বৃক্ষরাজি দাঁড়িয়ে, প্রাণীসমূহ রুকুতে, তৃণলতা বসাতে যেন নামায এবাদত আদায় করে থাকে। নামায শবে মীরাজে ফরয হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি মীরাজে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরীকায় আদায় করে তবে সে আল্লাহ পাকের দরবারে বড় উঁচু মর্যাদা লাভ করবে। এখলাস এবং সুন্নাতের পাবন্দ ব্যক্তিগণ আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য ও সান্নিধ্য নামাযের মধ্যেই তালাশ করে পান। আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) উম্মতের উপর একটি বড় এহসান করেছেন যে, নামাযের মত এবাদতকে ফরয সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং সেই সত্তার জন্য এহসান ও শোকর গুজারী এবং তাঁর জন্যই সকল প্রকার প্রশংসাবলী ও গুণকীর্তন হয়ে থাকে।

নামাযে আশ্চার্য ধরনের অন্তরের পবিত্রতা ও উপস্থিতি অর্জিত হয়। আমাদের মোর্শেদ বলেছেন যে, নামাযে যদি এই দৃষ্টিতে আল্লাহ্র দীদার না হয়, কিন্তু যে অবস্থা সৃষ্টি হয়, তা

দীদার হতে কম নয়। আর এটা পরীক্ষিত কথা। আর যখন বায়তুল মুকাদ্দাস হতে কেবলা পরিবর্তনের হুকুম হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কেবলা বায়তুল্লাহর দিকে হল তখন য়াহুদীরা আপত্তি করল যে, যে সকল নামায বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে আদায় করা হয়েছে সেগুলোর হুকুম কি হবে? তখন এই আয়াত নাযিল হলঃ আল্লাহ পাক চান না যে তোমাদের ঈমান (অর্থাৎ নামায) বিনষ্ট হোক। দেখুন, এখানে নামাযকে ঈমান বলা হয়েছে। সুতরাং নামাযকে মসনুন তরীকায় আদায় না করা, ঈমানকে বরবাদ করার শামিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ আমার চোখের শীতলতা ও আনন্দ নামাযের মধ্যে রাখা হয়েছে। এর মর্ম হচ্ছে এই যে, এতে আল্লাহ্র দীদার এবং সান্নিধ্য অর্জিত হয়, যা আমার চোখকে আরাম ও শান্তি প্রদান করে। (তিনি বলেছেন, তুমি যখন এবাদত করবে, তখন যেন এমন হয় যে, তুমি আল্লাহ্কে দেখছ)। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)-কে বলেছেন যে, হে বেলাল! আযান ও একামতে নামাযের দ্বারা আমাকে শান্তি দান কর। যদি কোন ব্যক্তি নিজের মনের শান্তি ও আরাম নামায ছাড়া মনে করে, তবে সে আল্লাহর বারগাহে মকবুল হবে না। কেননা, নামায তিলাওয়াত এবং অন্যান্য সকল প্রকার জিকির আজকার সম্বলিত। যে ব্যক্তি নামায বরবাদ করে, তবে সে ধর্মের অন্যান্য আহকামকে অধিক বরবাদকারী হবে।

রোযা ঃ

অপ্রয়োজনীয় কথা এবং গীবতের দ্বারা রোযার সওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। কেননা, গীবত নেক কর্মের সওয়াবকে মিটিয়ে দেয়। এটা পরিত্যাগ করা উচিত। বড় মুর্খতা হবে যে, এত মেহনত ও কষ্ট করে নেক আমল করা এবং এর সওয়াব বিনষ্ট হয়ে যাওয়া। মানুষের কর্মকান্ড আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হয়। সুতরাং বেহুদা কথা ও গীবতের বাক্যাবলী সেই অনুগ্রশীল মহান আল্লাহ্র দরবারে প্রেরণ করা বেআদবী বৈ কিছুই নয়।

বাদ্যযন্ত্র ও নাচ-তালের আওয়াজ শ্রবণ করা, ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন এবং অন্যান্য পবিত্র মাজাযের কল্পিত নমুনা বানানো, যা কোন কোন পীর ও ফকীর নিজেদের দিক থেকে তরীকা বানিয়ে নিয়েছে, যা মাযহাবে ইসলামের লজ্জা ও নিন্দার কথা। আর বুযুর্গদের ছবি অঙ্কন করে সেগুলোকে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ওছিলা হিসেবে পেশ করা হয়, ইসলামে তা যায়েজ নয়। বুযুর্গদেরকে না দেখে তাদের চিত্র বা নকশা বানানো মিথ্যা ও অসততা। আল্লাহ পাক এই শ্রেণীর লোকদের উপর দয়া করুন।

সাইয়্যেদ ইসমাঈল, আল্লাহ্ তাঁকে নিজ দানে বিভূষিত রাখুন– যিনি একজন আলেম মুহাদ্দেস এই বান্দাহর কাছে মদীনা মুনাওয়ারায় সিলসিলায়ে মুজাদ্দেদিয়া হাসিল করার জন্য এসেছিলেন। আমি তাকে আছার শরীফ ও বরকতময় স্থান সমূহ দেখার জন্য দিল্লীর জামে মসজিদে প্রেরণ করলাম। তিনি যাত্রার পরেই সত্বর ফিরে আসলেন এবং বললেন- সেখানে অংশীবাদীতা ও অন্ধকার রয়েছে। যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নূর সমূহও আছে। সেখানে আমি এক প্রতিবেশীকে জিজ্ঞেস করলাম, দরগাহ শরীফে কি কি নিদর্শনাবলী আছে? সে

বলল, অন্যান্য নিদর্শনাবলী ছাড়া একটি সিন্দুকে বুযুর্গদের ছবিও আছে। আমি নির্ঘাত বিশ্বাস করলাম যে, এই অংশীবাদীতার অন্ধকার এই ছবি ওলীর কারণেই। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে বায়তুল্লাহতে রক্ষিত মূর্তিগুলো যার মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মূর্তি ও ছবিকেও নিজ হাতে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। এই অংশীবাদী কাজের সত্যতা এই আয়াতের মাধ্যমে জানা যায়: "অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র উপর ঈমান রাখা সত্ত্বেও মুশরিক হয়।"

মোরগ লড়াই, কবুতরবাজি এবং প্রত্যেক খেলা হারাম। পাথর খোদাই করে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কদম শরীফ সাব্যস্ত করাও কবর পূজার অন্তর্ভুক্ত। কাফেরদের রুসম ও রেওয়াজ এখতিয়ার করা যেমন হুলী, দেওয়ালী, বিসনাত এবং অগ্নি উপাসকদের নওরোজের মত উৎসব পালন করা কাফেরদের সাথে সংশ্লিষ্টতা মাত্র। আল্লাহ পাক এগুলো থেকে হেফাজতে রাখুন। যখন পীরগণ এই মন্দ কথায় জড়িয়ে যায়, তাহলে মুরীদগণের চলে যাওয়ার পরওয়ানা মিলে গেছে বুঝতে হবে। পীরি-মুরীদীর নির্ভরশীলতা ও শুদ্ধতার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে 'তাকওয়া'। অন্তরের অবস্থাবলী কাশফ ও এলহাম ও স্বভাব বিরোধী কাজের অভিজ্ঞতা কাফেরদেরও হাসিল হতে পারে। সাধনা ও কাজের মোজাহাদা এবং সাধনার ধাক্কা লাগানো, যদ্বারা জাহেল সাধারণ আবদ্ধ হয়ে যায়- যেমন সাইফীর মত দোয়াসমূহ, তীগবন্দী এবং নফশে সোলায়মানীর তাবিজ তুমার লেখার দ্বারা দুনিয়া হাসিল করা যায়। এই বস্তুগুলির কোনই মূল্য ও মর্যাদা নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরিপূর্ণ পায়রবী করা, মুসলমানদের ধর্ম এবং মাযহাব। এটাই আল্লাহ পাকের বারগাহে ফিরে যাওয়ার মাধ্যম। আর এটাই সাহাবায়ে কেরাম এবং আহলে বাইতে এজাম (রাহঃ)-এর তরীকা এবং কুরআন শরীফের নুজুল শুধু এর জন্যই হয়েছে। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে স্বীয় পয়গাম্বর (সাঃ)-এর এবং তাঁর সাহাবাদের এবং আহলে বাইতে এজামের (রাঃ) সোজা রাস্তার উপর কায়েম থাকার তাওফিক দান করুন। (আমীন)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইজাহুত্ তারীকাহ্

হামদ ও দরূদের পর ফকীর আবদুল্লাহ্ ওরফে গোলাম আলী উফিয়া আনহু আরজ করেছেন যে, আমার বয়স ছিল ২২ বছর। আল্লাহ্ পাকের সীমাহীন অনুগ্রহ আমার সাথে মিলিত হল এবং আমি ফয়েজের স্থল, যুগের অলঙ্কার, মহাকালের একক ব্যক্তিত্ব, নূরের উদয়স্থল, সুনানে নবুভিয়ার গোপন রহস্য, কাইয়্যুমে তরীকায়ে আহমাদিয়া নকশেবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া শামসুদ্দীন হাবীবুল্লাহ হযরত মির্জা মাজহার জান জানান (আল্লাহ তার গোপন রহস্যকে সমুন্নত করুন)-এর খেদমতে হাজির হলাম এবং খান্দানে কাদেরিয়া আলীয়া-এর এরাদত ও বয়আতের মর্যাদা লাভ করলাম। হযরত মির্জা মাজহার জান জানান কুদ্দেসা সিররুহু যদিও নকশেবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া খান্দানের ফয়েজপ্রাপ্ত ছিলেন এবং সেই খান্দানের নেসবত মুরীদগণকে প্রদান করতেন এবং তিনি এই নকশেবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়ার নেসবত এবং এর এজাজত লাভ করেছিলেন সাইয়্যেদুস সাদাত হযরত সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বাদাউনী হতে এবং সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বাদাউনী হযরত শায়খ সাইফুদ্দীন এর খলীফা ছিলেন, তিনি আল ওরওয়াতুল বুছকা হযরত খাজা মোহাম্মদ মাছুম-এর প্রিয় সন্তান ছিলেন। হযরত মির্জা আকদাস সিররুহুকে কাদেরিয়া তরীকায় বয়আত করার এজাজত হযরত গাউছুস সাকালাইন রূহানী ভাবেও প্রদান করেছিলেন।

তিনি বলতেন যে, হযরত সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদের এন্তেকালের পর তার হুকুমে আমি শায়খুস্ শুয়ুখ হযরত মোহাম্মদ আবেদ সানামী (রহঃ)-এর নিকট হতে ফায়দা লাভ করি। তিনি হযরত শায়খ আবদুল আহাদ ছাজ্জাদানশীন হযরত মোহাম্মদ সাঈদ (রহঃ)-এর খলীফা ছিলেন। এই দু'জন বলেছিলেন যে (হযরত মির্জা সাহেব) আমি হযরত শায়খ আবেদ (রহঃ)-এর খেদমতে খান্দানে আলীশান কাদেরিয়া এর এজাজত লাভের আবেদন করেছিলাম। তিনি তা কবুল করলেন এবং আমি-ফকীরের প্রতি তাওয়াজ্জুহ প্রদান করলেন। এতে আমার উপর আত্মহারা ভাবের উদয় হল এবং আত্মহারা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিশ্বজোড়া সৌন্দর্য দর্শনে ধন্য হলাম। আমি দেখলাম যে, শায়খ আবেদ (রহঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দরবারে আমার জন্য খান্দানে আলীশান কাদেরিয়ার এজাজত প্রদানের জন্য আরজ করছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, গাউসুস্ সাকালাইন-এর নিকট আরজ কর। হযরত শায়খ মোহাম্মদ আবেদ (রহঃ) গাউছুস সাকালাইনের নিকট আরজ করলেন। তিনি তা কবুল করলেন এবং স্বীয় খাদেমকে হুকুম করলেন- বরকতময় এজাজতের খোরকা প্রদান কর। খাদেম রেশমী উপহার নিয়ে আসলেন এবং আমি-ফকীরের ঘাড়ে রেখে দিলেন। ফকীরের অভ্যন্তরে অত্যাশ্চর্য বরকত ও অবস্থার সৃষ্টি হল। যা বয়ান করা যায় না।

এই ঘটনার মোসাহাদার পর হযরত শায়খ কুদ্দেসা সিররুহুর নির্দেশে আত্মহারা অবস্থার অবসান ঘটল এবং তিনি এই মোবারক কারামাত দানের জন্য মোবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন। হযরত মির্জা সাহেব বলতেন যে, (এই এজাজতের দ্বারা) কাদেরিয়া নেছবতের নূর সমূহ যা এই খান্দানের মাশায়েখদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছিল, তা আমার মধ্যে আরও বেড়ে গেল।

হযরত মির্জা বলতে ছিলেন যে, আমার জনাব মোবারক খাজা কুতুব উদ্দিন হতে নেছবতে চিশতিয়াও পৌঁছে ছিল। এই নেছবতে চিশতিয়ার অবস্থাদি কখনো কখনো খোদবখোদ আমার মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ত এবং উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং আকর্ষণ যা এই খান্দানের আবশ্যিক উপকরণাদি তা আমার অন্তরকে আনন্দিত করে তুলত এবং এ সময়ে সেমার প্রতি অনুগ্রহ পয়দা হয় এবং দিল নরম হয় ও কান্নাকাটি পয়দা হয়। কবি বলেছেন ঃ "ভালবাসার লেনদেনকারীদের বাজারের শুরুতেই প্রত্যেক ঘরে ভিন্ন দোকান রয়েছে।"

হযরত মির্জা সাহেব নেছবতে নকশেবন্দিয়া কাদেরিয়া, মুজাদ্দেদিয়া এবং চিশ্‌তিয়ার সামষ্টিক পূর্ণতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বুযুর্গানে মোজাদ্দেদিয়ার নেছবত তাঁর উপর প্রবল ছিল। খান্দানে নকশেবন্দিয়ার শিষ্টাচার-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি এই তরীকায়ে আলীয়া নকশেবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়ার আজকার ও আশগাল শিক্ষা দিতেন। বিশ্বের আনাচ-কানাচ তাঁর ফুয়ুজ ও বারাকাত দ্বারা উপকৃত হত। তাঁর খলীফাগণ এবং তাঁর খলীফাগণের খলীফাগণ বিশ্বের আনাচে কানাচে আল্লাহর পথ তালাশকারীদের হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের কারণ হয়ে রয়েছেন। হযরত আকদাস কুদ্দেসা সিররুহু আমি মিসকীনকে জিকির ও বাতেনী অনুশীলনের তালকীন করলেন এবং আমি এই তরীকায়ে নকশেবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়ার উপর সার্বক্ষণিক দৃঢ়তা এখতিয়ার করলাম। আমি পনের বছর পর্যন্ত হযরত মির্জা সাহেবের সোহবত, হালকায়ে জিকির, তাওয়াজ্জুহ ও মোরাকাবার নূর সমূহ হাসিল করেছি এবং তাঁর প্রাণ সঞ্জীবনী তাওয়াজ্জুহ সমূহের বরকতে আমি তরীকায়ে আলীয়া মুজাদ্দেদীয়ার হালাত ও উদ্দেশ্য সমূহের সম্পর্ক হাসিল করলাম এবং এই তরীকায়ে আলীয়ার অবস্থাদি, মাকামাত, ব্যবহারিক আমল সমূহের আগ্রহের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি হাসিল করলাম। ওয়ালহামদু লিল্লাহি আলা জালিকা।

১২১২ হিজরী সালের সেই দিনগুলোতে কয়েকজন বন্ধু আমাকে বাধ্য করল যে, খাজেগানে নকশেবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়ার কালাম সমূহের কিছু উপকারিতা একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করি। কিন্তু এই উপকারিতার লিখন ও কথন বেশীরভাগ এই বুযুর্গগণের অধিক সোহবতের বরকতের ফয়েজ দ্বারা পরিণতি লাভ করে। তাছাড়া এই বুযুর্গগণের বাণীসমূহ বয়ান করা এবং এই বিষয়ের উপর কিছু লিপিবদ্ধ করা আমার মত উপায়-উপকরণহীনের শক্তির বহির্ভূত ব্যাপার। কবি বলেছেন ঃ "মাহবুবের সোহবতের সৌন্দর্য আমার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। অন্যথায় আমি তো কেবল মাটিই মাত্র।"

তরীকায়ে নকশেবন্দিয়ার বুনিয়াদী নীতিসমূহ ঃ

জেনে রাখুন, তরীকায়ে মুজাদ্দেদিয়ার বুনিয়াদী নীতি সমূহ তরীকায়ে নকশেবন্দিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এই নীতি সমূহ হচ্ছে এই ঃ

(১) ওকুফে কলবী, (২) ফয়েজদাতার প্রারম্ভিক তাওয়াজ্জুহ, (৩) অন্তর সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখা, (৪) সার্বক্ষণিক জিকির, (৫) শায়খের সোহবতকে দৃঢ়তর করা, প্রত্যেক মাকামে ফয়েজের প্রয়োগ এবং ফয়েজের উৎসের প্রতি খেয়াল রাখা এবং তরীকায়ে নকশেবন্দিয়ার আজকার ও আশগালের প্রতি দৃঢ়তা এখতিয়ার করা।

কিন্তু আকাবেরে মুজাদ্দেয়িার মাকামাত, ব্যবহারিক কার্যাবলী একটি ভিন্ন বুলন্দ বস্তু। এগুলোর সারমর্ম ও এই উপকারিতার আওতায় লেখা যেতে পারে।

আলহামদু লিল্লাহ! এই সব কিছু এ বান্দাহ্‌র পীর ও দস্তগীর তরীকায়ে মুজাদ্দেদিয়ার স্তম্ভ, সুনানে নবুভিয়ার জীবনদানকারীর সোহবতের বরকতে নসীব হল। এবং এই আকাবেরগণের সুলুকের সর্বশেষ মাকামাত হাসিল হল। এমন ব্যক্তিই প্রাপ্তির নিরিখে জানে যে, এই মাকামাতগুলো কি এবং এই ফুয়ুজ ও বরকতের সমুদ্রের মধ্যমনি কে?

কবি বলেছেন ঃ "এই পথের মধ্যে এর চেয়ে অধিক অনুধাবনের সুযোগ নেই, সুতরাং তোমার অনুধাবনের শেষ প্রান্ত এটাই যে, আল্লাহ-ই যথেষ্ট।"

হযরত বলেন যে, তরীকায়ে মুজাদ্দেদিয়া শরীফের শেষ মাকসুদ 'দাওয়ামে হুজুর' (সার্বক্ষণিক উপস্থিতি) এবং সার্বক্ষণিক সতর্ক থাকা জাতে এলাহীর প্রতি এবং এর সাথে সহীহ আকীদাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জমায়াতের থাকতে হবে এবং সুন্নাতে নবুভীর এত্তেবা ও অনুসরণ আবশ্যিক হতে হবে।

যদি সালেক এই তিনটি বিষয় (সার্বক্ষণিক আল্লাহ্‌র স্মরণ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমায়াতের মত সহীহ আকীদাহ ধারণ করা এবং সুন্নাতের অনুসরণ)-এর কোন একটি সম্পর্কে অবহিত না হয়, তবে সে তরীকা হতে খারিজ বলে বিবেচিত হবে। (নাউজু বিল্লাহ মিন্‌হা)। সাহাবায়ে কেরামের স্তরে এই দাওয়ামে হুজুর-এর অবস্থা এবং সার্বক্ষণিক অবহিতিকে এহসান বলা হয়। আর সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় এই মাকামকে শুহুদ ও মুশাহাদাহ-এর ইয়াদ দাস্ত এবং আইনুল ইয়াকীন বলে।

ইসমেজাত জিকিরের তরীকা ঃ

আকাবেরে মুজাদ্দেদিয়া এই নেয়ামত অর্জনের জন্য যা ওবুদিয়াত বিশুদ্ধির সারমর্ম, তিনটি বলে নির্ধারণ করেছেন।

প্রথম তরীকা ঃ দায়েমী জিকির, এর সমুদয় শর্তের প্রতি সতর্কতাসহ। জিকির দু'প্রকার। প্রথম ইসমে জাতের জিকির। এর তরীকা হচ্ছে এই যে, জিহ্বাকে তালুর সাথে লাগিয়ে

রাখবে এবং অন্তরের ভাষায় যার অবস্থান বাম পোস্তানের দু'অঙ্গুলী নীচে জিকির করবে। ইসিম মুবারক হচ্ছে আল্লাহ। এর অর্থের প্রতি সতর্ক থাকবে যে, আল্লাহ পাকের সত্তা পরিপূর্ণ গুণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং অপূর্ণ গুণ হতে বিমুক্ত ও পবিত্র। (মনে রাখবে) যে আমি এই সত্তার উপর ঈমান এনেছি। এই সতর্কতাকে 'পরদাখতে অজুদে জেহনী' বলে। জিকিরের সময় শরীর এবং জবানকে কখনও নড়াচড়া করবে না। সালেক এই জিকির সর্বদা দিলের ভাষায় করতে থাকবে। এ পর্যন্ত যে দিল জারী হয়ে যায়।

তারপর লতিফায়ে রূহ হতে যার অবস্থান বাম পোস্তানের দুই অঙ্গুলী নীচে। সেখানে ইসমেজাতের জিকির করবে। এই লতিফা জারী হওয়ার পর লতিফায়ে ছির-এর মাধ্যমে জিকির করবে, যার অবস্থান বাম পেস্তান বরাবর মধ্যবর্তী বুকের দিকে দুই অঙ্গুলী দূরত্বে। এখানেও ইসমেজাতের জিকির একইভাবে করবে, এই পর্যন্ত যে, এই লতিফাও জারী হয়ে যাবে। তারপর লতিফায়ে খফী যার অবস্থান ডান পেস্তান বরাবর সিনার ডান দিকের মধ্যবর্তী অংশের দুই অঙ্গুলী দূরত্বে অবস্থিত। এখানেও ইসমেজাতের জিকির করবে। তারপর লতিফায়ে আখফা যার অবস্থান সিনার মধ্যবর্তী স্থলে জিকির করবে। এ পর্যন্ত যে এই লতিফাও জারী হয়ে যায়। আলমে আমরের এই পাঁচটি লতিফা জারী হওয়ার পর লতিফায়ে নাফসে ইসমে জাতের জিকির করবে। এর অবস্থান কপালের মধ্যবর্তী স্থলে। তারপর লতিফায়ে কালেবিয়া (অর্থাৎ সমস্ত দেহে) দ্বারা ইসমেজাতের জিকির করবে, যা তরীকায়ে মুজাদ্দেদিয়ায় প্রচলিত। একে সুলতানুল আজকার বলে।

তরীকায়ে জিকরে নফী ও ইসবাত ঃ

জিকির দু'প্রকার। নফি ও ইসবাত। এই জিকিরের তরীকা হচ্ছে এই যে, নিজের শ্বাসকে নাভীর নীচে বন্ধ করবে। তারপর জিহ্বাকে তালুর সাথে লাগাবে এবং 'লা' কালেমাকে খেয়ালের মাধ্যমে নাভী হতে মাথার তালু পর্যন্ত পৌছাবে এবং 'ইলাহা' কালেমাকে ডান কাঁধের উপর নিয়ে আসবে। আর 'ইল্লাল্লাহ' কালেমাকে কলবে এমনভাবে জরব দিবে যেন পাঁচটি লতিফাই প্রভাবিত হয়ে যায় এবং 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' শব্দকে শ্বাস ছাড়ার সময় খেয়ালের মাধ্যমে বলবে।

১। জিকিরে এই শর্ত যে এর অর্থের দিকে খেয়াল রাখবে। (এই অর্থে যে) আল্লাহ্ পাকজাত ছাড়া আমার কোন উদ্দেশ্য নাই। প্রত্যেক শব্দের জন্যই অর্থের খেয়াল জরুরী। (কেননা) অর্থ ছাড়া শুধু শব্দ কিছুই না।

২। এবং শর্তাবলীর মধ্যে এটাও যে, 'নফীর' সময় নিজের এবং সকল মাখলুকের নফী করবে এবং ইসবাতের সময় শুধু আল্লাহ্ পাকের 'ইসবাত' করবে। যদিও সকল মাখলুকের নফী পূর্বেই করেছে। কিন্তু এর খেয়াল রাখা খুবই বিস্তৃত ব্যাপার।

৩। আরও শর্তাবলী এই যে, উভয় প্রকার জিকিরে কয়েকবার জিকির করার পর দিলের ভাষায় পরিপূর্ণ নম্রতা, একাগ্রতা ও বিনয়সহ আরজ করবে যে, হে আল্লাহ্! আমার মাকসুদ

কেবল তুমিই। তোমার রেজামন্দিই আমার উদ্দেশ্য। আমি দুনিয়া এবং আখেরাত কেবল তোমার জন্যই ছেড়ে দিয়েছি। আমাকে তোমার মহব্বত ও মারেফাত দান কর। যদি তালেব (প্রত্যাশী) দরবেশ গুণসম্পন্ন ও সাদেক (সত্যবাদী) না হয়, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাত ছেড়ে দেয়ার কথা উল্লেখ করবে না। তা না হলে উভয় শব্দের উল্লেখ অবশ্যই করবে।

৪। এটাও শর্ত যে, কলবের দিকে খেয়াল রাখবে। কিন্তু দিলের ছনুবরী আকৃতি অথবা ইসমেজাতের চিত্রের খেয়াল করবে না। আর এই খেয়াল রাখাকে 'অকুফে কলবী' বলা হয়। এই খেয়াল অন্যান্য তরীকায় 'জরব' বা ধাক্কা লাগানোর স্থলাভিষিক্ত।

৫। আর ইহাও শর্ত যে আল্লাহ্ পাকের সত্তার দিকে খেয়াল করবে। নজর উপরের দিকে হবে, যেন আল্লাহ্ পাকের সত্তাকে দেখছে এবং ফযেজ আগমনের জন্য এন্তেজার করবে। উপরের দিকের খেয়াল আদবের কারণে করবে যে, 'আল্লাহ' পাক সকল বস্তু হতে উত্তম ও পবিত্র। অকুফে কলবী এবং ফয়েজ দানকারীর প্রারম্ভ জিকিরের রোকন। আর এর তরীকা হলো যে 'হুযুর মায়াল্লাহ' (আল্লাহ্র সাথে হাজির থাকা)-এর নেছবত অর্জন এই রোকন ছাড়া দুঃসাধ্য ব্যাপার।

৬। আর এটাও শর্ত যে, জিকিরের সময় দিল সকল খেয়ালাত এবং প্ররোচনা হতে বিমুখ থাকবে এবং যে সময় দিলের মধ্যে (অন্যের) খেয়াল আসবে, তখন ছেড়ে দেবে যেন অন্যের খেয়ালাত দিলের উপর বিজয়ী হতে না পারে।

এই অবস্থাকে (তাসাউফের ভাষায়) নেগাহ দাশ্ত বলে। শ্বাস বন্ধ করা জিকিরের সময় উত্তম। কিন্তু জিকিরের শর্তাবলীর মধ্যে নয়। শ্বাস বন্ধ করলে কলবের তাপ, আগ্রহ, অন্তরের নম্রতা ও নফীর খেয়ালাত, অনুরাগ এবং মহব্বত পয়দা হয়।

নফস (শ্বাস) বন্দীর দ্বারা এটাও সম্ভব যে, সালেক কাশফের অধিকারী হয়ে যাবে।

নফী, ইসবাত জিকিরে বেজোড় সংখ্যার দিকে খেয়াল রাখবে। একে 'অকুফে আদদী' বলা হয়।

(আকাবেরগণ) বলেছেন যে, অকুফে আদদী এলমে লাদুন্নীর প্রথম সবক যে, এই জিকিরের দ্বারা অবস্থাবলী এবং এগুলোর এলেম অর্জিত হয়। গোপন রহস্যাদির প্রকাশ এবং এগুলোর পরিচিতি এই জিকিরের বদৌলতে হয়। এই জিকির হযরত খিজির (আঃ) হতে নফসবন্দীর উপলক্ষ সহ বর্ণিত আছে। সুতরাং যদি এক শ্বাসে নফী ইসবাতের জিকিরকে (প্রত্যাশী) একুশবার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, কিন্তু উপকারিতা না পায়, নিদর্শনাবলী প্রতিভাত না হয়, তাহলে তার আমল বাতিল এবং মূল্যহীন এবং তরীকার মধ্যে গণ্য নয়। সেই আমল দ্বিতীয়বার শুরু করবে এবং সকল শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

দ্বিতীয় তরীকা মোরাকাবা ঃ

(এই সিলসিলার) দ্বিতীয় তরীকা মোরাকাবা। অর্থাৎ মাধ্যমহীন জিকির এবং মোর্শেদের মাধ্যমহীন (মুরীদ) নিজের দিলের দিকে মুতাওয়াজ্জু হবে এবং একে গায়রুল্লাহ্‌র খেয়ালাত হতে পবিত্র রাখবে এবং ফয়েজে এলাহীর প্রতি দৃষ্টি রাখবে।

উচিত হল সর্বদা আজিজী ও বিনম্র চিত্তে আল্লাহ্ তায়ালার সত্তার দিকে মুতাওয়াজ্জু হবে। এ পর্যন্ত যে আল্লাহ্ তায়ালার মধ্যে ডুবে যাবে। আর এই সার্বক্ষণিক খেয়াল আল্লাহ পাকের সত্তার এবং সার্বক্ষণিক তাওয়াজ্জু উচ্চতর জিকির ও আজকারের মূল উদ্দেশ্য। (ইসমে জাতের) জিকিরের লক্ষ্য হল 'হুযুর মায়াল্লাহ'। এই জিকিরের মাধ্যম মাকসুদ নয়। তিনি বলেন- যজবার সাথে মোরাকাবা নফী ইসবাত জিকির হতে অধিক নিকটবর্তী। যদি সার্বক্ষণিক মোরাকাবা হাসিল হয়, তাহলে মুরীদকে ওজীরের মর্যাদা হাসিল হয়। (অন্যের) মনের কথা তার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং মূলক ও মালাকুতের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে। কিন্তু মোরাকাবার সামর্থ অধিক জিকির ছাড়া ও শায়খের সোহবত ছাড়া হাসিল হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

তৃতীয় তরীকা রাবেতায়ে (সম্পর্ক) শায়খ ঃ

তৃতীয় তরীকা শায়খে কামেলের সোহবত। তাঁর সোহবতের দ্বারা এবং তাঁর এখলাসের বরকতে (মুরীদের) দিলের অলসতা দূর হয়। আল্লাহ্‌র মহব্বতের আকর্ষণে (মুরীদের) দিলের উপর মোশাহাদায়ে এলাহীর নূর সমূহ চমকাতে থাকে। (মুরীদের জন্য আবশ্যক যে) শায়খে কামেলের উপস্থিতিতে আদবের প্রতি খেয়াল রাখবে এবং তার অন্তরকে খুশী রাখবে এবং (শায়খে কামেলের) অনুপস্থিতিতে তাঁর দিকে কল্পনার দৃষ্টি রাখবে এবং ফয়েজ লাভ করবে। তিনি বলেছেন যে তাসাউফ সম্পূর্ণই আদব। আর কোন বেআদব আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না। কবি বলেছেন ঃ যে ছোট শিক্ষাদাতা প্রভু (অর্থাৎ পীর ও মোর্শেদকে) বরবাদ করে দেয়, সে বড় রব্বুল আকবর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না। আকাবেরগণ বলেছেন যে, শায়খে কামেলের এই তৃতীয় তরীকা জিকির এবং তরীকায়ে মোরাকাবা হতে অধিক আসান এবং আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছানেওয়ালা। একে জিকরে রাবেতা বলা হয়।

শায়খে কামেলের সোহবত ঃ

শায়খে কামেল ঐ ব্যক্তি, যার জাহের সুন্নতের অনুসরণে বিরঞ্জিত এবং বাতেন আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছু হতে পবিত্র। তাঁর সোহবতে এই প্রভাব সৃষ্টি হয় যে, মুরীদ তার সোহবতে আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছু হতে মুক্ত হয়ে যায় এবং তাঁর হিম্মতের দ্বারা মুরীদের দিল আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু (স্মরণ থাকে যেন) প্রভাব সেই পরিমাণই হবে, যতটুকু চেষ্টা এবং এখলাস থাকবে। এভাবেই মুরীদের উপর পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পেতে থাকবে। কবি বলেছেনঃ "তুমি যার সাহচর্য এখতিয়ার করবে তাতে যদি অন্তরের নিবিষ্টতা না পাওয়া যায় এবং মাটি-কাদার

অবিলতা দূর না হয়, তাহলে তার সোহবত হতে পলায়ন কর, কখনও বসবে না, অন্যথায় তোমার রূহ পবিত্রতার আলো লাভ করবে না।"

শায়খে কামেল মোকাম্মেলের তাওয়াজ্জুর প্রভাবে এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ যে, পর্যায়ক্রমে অন্তরের নিবিড়তা আল্লাহ্‌র দিকে আকর্ষণ ও অন্তরের বিনম্রতা হাসিল হয়ে যায়, যা আবরণ সমূহ উঠে যাওয়ার আলামত এবং গরমী ও উত্তপ্ততার প্রকাশ যদিও আগ্রহ বৃদ্ধি করে কিন্তু প্রথম যুগে তা ছিল না।

মনে রাখ যে, এই তরীকা শরীফে গ্রহণযোগ্য কাজ এই যে, তালেব যে সময় চায় বিভোর হয়ে যায়। সর্বাগ্রে নিজের গোনাহসমূহ হতে কয়েকবার তাওবাহ ও এস্তেগফার করবে এবং মৃত্যুকে হাজির মনে করবে, তারপর সেই দরবেশের ছুরত যার নিকট হতে জিকির হাসিল করেছে, আদবপূর্ণভাবে নিজের মনে কল্পনা করবে, যেন নিবিড়তা ও অবস্থার সৃষ্টি হয়। তারপর জিকিরে তার শর্তাবলীসহ মশগুল হবে। সর্বপ্রথম ইসমেজাত জিকির শুরু করবে, যা উত্তাপ এবং আগ্রহ সৃষ্টির পরিচায়ক। তারপর নফী ও ইসবাতে মশগুল হবে। যদি অন্তর দম বন্ধ করার দরুন থেমে যায়, তাহলে খোলা নিঃশ্বাসে জিকির করবে এবং জিকির ও মোরাকাবার মধ্যে মনোনিবেশ একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে করবে। অমনোযোগী জিকির ওয়াসওয়াসা হতে বেশী কিছু নয়।

জিকরে তাহলীলে লেসানী ঃ

জিকরে তাহলীলে জবানী যদিও হুজুর-এর যোগ্যতা অর্জন হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত নয়, কিন্তু উল্লেখিত শর্তসমূহ সহ উপকারীও বটে। জিকির অধিকহারে করা চাই। অধিক জিকির ছাড়া দিল খোলে না। নিজের সময়গুলোর মধ্য হতে একটি সময়ও যেন আল্লাহ্‌র স্মরণবিহীন ব্যয় না হয় এবং লোকজনের সাথে মোলাকাত এবং মজলিসের সময়ও আল্লাহ্‌র জিকির ও স্মরণে মশগুল থাকবে। কবি বলেছেন ঃ "সত্যের ফয়েজ অকস্মাৎ পৌঁছে যায়, কিন্তু সচেতন অন্তরের উপরই তা আবির্ভূত হয়। একটি চোখ বুজে যাওয়ার সময়ও সেই চাঁদ হতে গাফেল হয়ো না; হতে পারে তিনি তোমার প্রতি দৃষ্টি দান করবেন, আর তুমি তা বুঝতেও পারবে না।"

এই অবস্থাকে 'খেলওয়াত দর আঞ্জুমান' বলা হয়। অর্থাৎ হাকিকতের প্রতিষ্ঠাতা এবং আকৃতি প্রদানকারী। একজন সুফী কায়েন ও বায়েন উভয়ই।

জেনে রাখ, যখন দিলের সম্পর্ক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর সাথে স্থাপিত হয়, মন্দের চিন্তা দৃঢ়তর হয়ে উঠে। তখন আল্লাহ্‌র ফয়েজ অভ্যন্তরে পৌছতে বদ্ধকতার সৃষ্টি হয়। এজন্য 'লা' কালিমার দ্বারা এ সকল ঘৃণিত স্বভাবগুলোকে নিঃশেষ করে দিতে হবে। যেমন হিংসুক রোগীকে 'লা' বলার সময় হিংসার নফী করতে হবে এবং ইল্লাল্লাহ-এর সময় আল্লাহর মহব্বতের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। এভাবে নফী এবং ইসবাতের দ্বারা এবং আল্লাহ্‌র দরবারে বিনয়সহ মন্দ স্বভাবের প্রতিরোধ করতে হবে। যেন সেই মন্দগুলো নিঃশেষ হয়ে যায় এবং অভ্যন্তরের যাবতীয় প্রতিরোধ দূর হয়ে যায়। যাতে করে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জিত

হয়। এই কাজ অনুশীলন 'সফর দর ওয়াতন' এর একটি প্রকার। জিকিরের দ্বারাই ফানা এবং বাকা হাসিল হয় এবং জিকিরের দ্বারাই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছা যায়। কবি বলেছেনঃ 'জিকির কর জিকির, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মধ্যে প্রাণ আছে। আল্লাহ্র জিকিরের দ্বারা অন্তর পবিত্র হয়। আল্লাহ্র জিকির বেশী করে কর, যেন তুমি মুক্তি লাভ করতে পার।'

দাওয়ামে হুজুর ঃ

যখন জিকিরে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন এর হেফাজত করতে হবে। যদি এই অবস্থা অদৃশ্য হয়ে যায় তাহলে পুনর্বার জিকির করবে। যাতে করে অবস্থা এবং হুজুর বা উপস্থিতি দৃঢ়তর হয়ে যায়।

যখন অনুরাগ মকবুল হয়ে যায়, তখন ফয়েজের শীতল বাতাস ও রহমানী বায়ু সঞ্চালিত হতে থাকে। কখনো কখনো ফয়েজ অন্তরে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে বেখোদী পয়দা করে দেয়। যখন এই অবস্থা ক্রমাগতভাবে হতে থাকে, তখন আল্লাহ্র দরবারে দাওয়ামে হুজুর ও ফানা হাসিল হওয়ার আশা পোষণ করবে।

দাওয়ামে হুজুর হাসিল হওয়ার পর তালেব হাকিকতে জিকিরের উপর অধিষ্ঠিত হয়। এর পূর্বে জিকিরের ছুরত ছিল, হাকিকত ছিল না। এই মর্মের অর্জন তালেবের জন্য এই তরীকার মধ্যে জিকির ও আশগাল সংগ্রহ করার মত। অন্যান্য তরীকায় এই হালত অর্জন করা মোর্শেদের তাওয়াজ্জু-এর শক্তির উপর নির্ভরশীল। কারও অতি তাড়াতাড়ি এবং কারও দেরীতে তা হাসিল হয়। এই তরীকায়ে মোজাদ্দেদিয়ার পূর্বসূরী অনুসারে 'লাতায়েফ'-এর মর্ম হচ্ছে আল্লাহ্র দরবারে হাজিরীর কামিয়াবীর মর্যাদা। হুজুরে হক যদি হুজুরে খালকের বরাবর হয়, তবে একে জিকরে কলব বলে। যদি হুজুরে হক হুজুরে খালকের উপর বিজয়ী হয়, তবে একে 'জিকরে রূহ' বলে। যদি হুজুরে হক পাওয়া যায় হুজুরে খালাক না থাকে, তবে একে জিকরে ছির বলে। যদি হুজুরে হক হয় এবং নিজে ও হুজুরে খালক না থাকে, তবে একে জিকরে খফী বলে। কবি বলেছেনঃ "যদি রুহুল কুদ্দসের ফয়েজ সাহায্য করে, তবে আজ অন্য কেউ ঐ সকল কাজ করে যাবে, যা ঈসা (আঃ) করছিলেন।"

হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানীর মতে প্রত্যেক লতিফা পৃথক পৃথক। এজন্য তিনি সত্য পথের তালেবানদের লতিফা সমূহের শিক্ষা ও পথ চলা পৃথক পৃথক বলতেন।

হযরত মুজাদ্দেদ বলতেন- এই তরীকা যা পূর্ণ করার জন্য আমরা নিয়োজিত আছি– এর সবটুকুই সাত কদম। এর মধ্যে পাঁচ কদম আলমে আমরে এবং দু'কদম আলমে খালকে রয়েছে। আর দুই কদম বলা আলমে আমর ও আলমে খালকের অনুসারে। কিন্তু হযরত মুজাদ্দেদ (রহঃ)-এর পুণ্যবান সন্তানগণ (আল্লাহ্ পাক তাদের ভেদ সমূহকে পবিত্র করুন) ফানায়ে কলবের অর্জনের পর লতিফায়ে নাফসের শিষ্টতাকে নির্ধারণ করেছেন যে, কলব ও নাফসের সুলুকের আওতায় এই চারটি লতিফার ও ফানা এবং বাকা অর্জিত হয়। আর

এ সময়ের এটাই প্রচলন যে, মানুষের অবসর থাকে না। তাদের সামনে অন্যান্য কাজও উপস্থিত থাকে।

তিনি বলেন, যখন সালেক অন্তরের দিকে মুতাওয়াজ্জু হয় এবং নিজের দিলকে আল্লাহ্ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জু পায়, তবে এই হালতে দাওয়ামে হুজুর এবং হুজুর অর্জিত হয়। যদিও হুজুরের জ্ঞান সকল সময় হাজির থাকে না। সুতরাং নিজের নফসের হুজুরের জ্ঞান কাজে নিয়োজিত থাকাকালে কম হয়। জ্ঞান আছে এবং জ্ঞানের জ্ঞান নেই। যখন সর্বদা দায়েমী আত্মহারা আত্মিক ও অবস্থার মধ্যে এক সার্বক্ষণিক অবস্থা, সার্বক্ষণিক দৃষ্টি ও এন্তেজার (যেমন তুমি আল্লাহ পাককে দেখছ) জাগ্রত, নিদ্রা, কথোপকথন এবং রাগ করায় হালতে কালবের আবশ্যিক স্বভাবে পরিণত হয় এবং অনুপস্থিতহীন হুজুর শাক্তিশালী হয়, এটা সার্বক্ষণিক সচেতনতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আর এটাই হচ্ছে 'ইয়াদদাশ্‌ত'। ইহা ছাড়া সবই খাম-খেয়ালী। এই হালতকে আইনুল ইয়াকীন বলে। কবি বলেছেনঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার বন্ধুকে সর্বদা নিজের মাথার চোখ দ্বারা না দেখব, সে সময় পর্যন্ত আমি স্বীয় তালাশের পথ চলা হতে কোথায় বসতে পারি? লোকে বলে যে, আল্লাহ্ পাককে এই মাথার চোখে দেখা যাওয়া সম্ভব নয়, তারা তাদেরই মত। কিন্তু আমি তাঁকে হরদম নিজের চোখেই দেখছি।"

এই চতুর্পদী কবিতায় নিম্নলিখিত অবস্থাবলীর (ইয়াদ দাশ্‌তে আনাহী এবং আইনুল ইয়াকীন) দিকে ইশারা করা হয়েছে। কিন্তু কবি উত্তেজনার প্রাবল্যের কারণে চোখের দেখাকে এবং দৃষ্টি শক্তির মোশাহাদার মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারেনি। আর (স্মরণ থাকা দরকার) জাহেরী চোখ দ্বারা দুনিয়ার জিন্দেগীতে আল্লাহ্‌র দর্শন সম্ভব নয়। (এটাই আমাদের আকীদা ও বিশ্বাস)।

বেলায়েতে ছোগরা ঃ মোরাকাবায়ে মা'ইয়াত

এর পরে হল- 'মোরাকাবায়ে মা'ইয়াত' (ওয়া হুয়া মায়াকুম আইনামা কুনতুম) আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন।

মুরুব্বিগণ এই জিকিরে তাহলীল জবানী পদ্ধতিতে করতে বলেন এবং এই মোরাকাবা বেলায়েতে ছুগরাতে করতে বলেন, যারা বেলায়েতে আউলিয়া আল্লাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত। এই বেলায়েত 'ছায়রে আসমায়ে এলাহীর' ছায়ায় রয়েছে এবং এটা মহব্বতে এলাহীর অনুরাগের মোকাম ও অনুরাগ অর্জনের মোকাম। এ স্থলে অনুরাগ, নেছবতের প্রাবল্য ও উত্তাপ, আগ্রহ, কান্নাকাটির শব্দ ও আহাজারী, অধীরতা ও প্রাপ্তি এবং বহুত্বের মধ্যে একক সত্তা এবং অন্যান্য পরিচয়ের হালত। ভয় ও আতঙ্ক এবং পেরেশানী নসীব হয়। আর আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য এবং তাঁর অধিকারের রহস্যাবলী দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির উপর প্রকাশ পায়। আর যদি এমনটি না হয়, তবে সে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যের অনুভূতি লাভ করে। যেমন এই বেলায়েতে ছোগরার মাকামের উপর অধিষ্ঠিত আউলিয়া আল্লাহ্‌দের কাছে অব্যক্ত নয় এবং এটা তাদের খেয়ালেই নাই। বরং তাদের প্রাপ্তি হচ্ছে অনুভব ও উপলব্ধি। কবি বলেছেনঃ "খাজা মনে করে যে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছা হাসিল হয়ে গেছে, কিন্তু ইহা তার নিজের প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।"

ফানায়ে কলব ঃ

বেলায়েতে ছোগরার মধ্যে ডুবে যাওয়া আছে, আত্মহারা হওয়া আছে, স্বস্তি আছে। এই বেলায়েতে অন্তরে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছু জ্ঞানগত ও প্রেরণাগত সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায় এবং কলবের 'মা ছাওয়াল্লাহ'-এর পূর্ণ বিস্তৃতি হাসিল হয়ে যায়। এই অবস্থাকে ফানায়ে কলব বলে। কবি বলেছেনঃ "যে স্বয়ং নিজ থেকে পৃথক হয়ে গেছে সে স্বয়ং কোথায় রয়েছে? আমি এবং তুমি চলে গেছি, শুধু আল্লাহ রয়ে গেছেন।"

ফানার শ্রেণীভেদ ঃ

বুযুর্গগণ ফানার শ্রেণীভেদ চার প্রকার করেছেন–

প্রথমত: ফানায়ে খালক ঃ তালেবের যাবতীয় আশা এবং ভয় 'মা ছাওয়াল্লাহ' হতে চিরতরে ছিন্ন হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত: ফানায়ে হাওয়া ঃ অন্তরে আল্লাহ্র সত্তার আকাঙ্খা ছাড়া কোন আশা ও খাহেশ অবশিষ্ট থাকে না।

তৃতীয়ত: ফানায়ে এরাদাহ ঃ অন্তর হতে সকল খাহেশাত দূর হয়ে যায়। যেমন মৃত্যুর দ্বারা হয়।

চতুর্থত: ফানায়ে ফেল ঃ এ পর্যায়ে তালেবের ক্রিয়া বা ফেল ফানা হয়ে যায় এবং তার দেখা, শোনা, বলা, খাওয়া, পান করা, উপলব্ধি করা শুধুমাত্র আল্লাহরই হয়ে যায়।

হাদীসে কুদশীতে আছে, বান্দাহ নফল এবাদতের দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে। এমনকি আমি তাকে বন্ধু বানিয়ে নেই। তারপর আমি তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই, যদ্বারা সে শ্রবণ করে। তার চোখ হয়ে যাই যদ্বারা সে দেখে। তার হাত হয়ে যাই যদ্বারা সে কোন বস্তু ধরে। তার পা হয়ে যাই, যদ্বারা সে চলে। কবি বলেছেন ঃ

"সুফীর জ্ঞান, আল্লাহ্র জ্ঞানেরই ঝর্ণাধারা। সুফীর সমস্ত গোপন ভেদ ও পরিচিতি হচ্ছে এলহামী এবং আল্লাহ্র দান। তার নিজের কিছুই নাই। কেউ বিশ্বাস করুক চাই না করুক, আল্লাহ পাক স্বীয় জ্ঞানের ঝর্ণাধারা সুফীর কলবে জারী করে দেন।"

মাকামাতে আশারা ঃ

বেলায়েতের মাকামাত অর্জনের জন্য (১) তাওবাহ, (২) এনাবত, (৩) যোহ্দ, (৪) কানায়াত, (৫) ওরা, (৬) ছবর, (৭) শোকর, (৮) তাওয়াক্কুল, (৯) তাসলীম ও (১০) রেজার মাকামাত হাসিল করা জরুরী। এগুলো ছাড়া বেলায়েতের চিন্তা করা যায় না।

কখনো এমনটি হওয়াও সম্ভব যে, এই মাকামাতের মধ্য হতে কোন মাকামের উপর কোন অলীর কদম দৃঢ়তা অর্জন করেনি। কিন্তু এই সকল মাকামাত অলীর অতিক্রম করা জরুরী।

এই খান্দানে (মুজাদ্দেদিয়া) এই মাকামাত অতিক্রম করা এজমালী ও প্রেরণা দায়ক। যখন অন্যান্য সিলসিলার মধ্যে এই মাকামাত বিস্তৃতভাবে অতিক্রম করা হয় যে, এই স্থলে ভ্রমণ 'ছায়রে তাফসিলী ও ছুলুকী'। জেনে রাখ, এই তরীকার আকাবের পুণ্যাত্মাগণের কথায় হুজুরীর যোগ্যতা অর্জনের পূর্ণ তৃষ্ণা এবং ফানা ও বাকা রয়েছে।

তারা বলেন, শেষ ফল হচ্ছে এন্তেজার বা অপেক্ষার। সুতরাং তালেবের যদি দায়েমী হুজুর মায়াল্লাহ হয়ে যায়, এবং নেছবতে কলবীর বিস্তৃতি লাভে ধন্য হয় এবং যে 'হুজুর মায়াল্লাহ' তার হাসিল হয়েছে ইহা ষষ্ঠ দিক (অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এবং উপর ও নীচ) পরিবেষ্টনকারী হয় এবং তার আল্লাহ্‌র দিকে তাওয়াজ্জুহ বেকাইফ বা অবস্থাহীন হয়ে যায়, তখন সে ঐ নেছবতের পরিপোষণ করে এবং তারই উপর দৃঢ় থাকে। তবে তার হুজুর মায়াল্লাহ-এর উচ্চতর মর্যাদা নসীব হয়। এই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের বন্ধুদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় এবং ওয়াহ্‌দাতের দরিয়ায় ডুবে যায় এবং আমাদের তরীকার এজাজত লাভের উপযুক্ত হয়।

ফানায়ে নাফস ও কামালাতে বেলায়েতে কুবরা ঃ

কিন্তু তরীকায়ে আলীয়া মুজাদ্দেদিয়ায় যতক্ষণ পর্যন্ত তালেব ফানায়ে নাফস এবং কামালাতে কুবরা অর্জন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সার্বিক এজাজত দেওয়া হয় না। ফানায়ে কলবীতে অন্তর হতে ভয় চলে যায় কিন্তু দেমাগে এসে যায়। তারপর ভয়ের অনুভূতি লাভে সমর্থ হয় যে ভয় কোথা হতে আসে ও নির্ভয় হয়ে যায়। দিল ও দেমাগ হতে ফানা হয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানদের নিকট অসম্ভব মনে হয় এবং বুদ্ধির খেলাফ বিবেচিত হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌ তায়ালার বন্ধুদের তরীকা জ্ঞানও দৃষ্টির বাইরে। কলবের কর্মকাণ্ডের পূর্ণতার পর শিষ্টাচারে (তাহজীব) লতিফায়ে নাফস হযরত মুজাদ্দেদ (রহঃ)-এর মতে যার স্থান মানুষের কপালে নির্ধারিত আছে। মাকামে কলবের পরিপূর্ণ জ্ঞান যা বেলায়েতে ছোগরা তা কাশফ ও মারেফাতের অধিকারীদের জন্য আছান হয়ে যায়। কিন্তু আহলে বেজদান (অনুভূতিশীলদের) ও আগ্রহীগণ আল্লাহর নিকট হতে এলহাম, এলকা অথবা মাশায়েখে কেরামের নিকট হতে অবহিত হন।

হতে পারে যে, এই অর্জনের নেছবতের নূর সমূহের নিদর্শনে বিস্তৃতি এসে যায়। যেন বক্ষস্থল ও নূর দ্বারা পানি ভর্তি পেয়ালার মত হয়ে যায়। আর উপরের দিকে তাওয়াজ্জুহ-এর মধ্যে পরিদর্শন অনিশ্চিত হয়ে যায় ও আচ্ছাদিত হয়ে যায় এবং হুজুরের মধ্যে সামর্থ বেড়ে যায়। ওয়াল এলমু ইন্দাল্লাহ!

মোরাকাবায়ে আকরাবিয়াতে হযরতে জাত ঃ

বেলায়েতে কুবরা এই স্থলে 'নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ' (আমি মানুষের শাহরগ হতেও অধিক নিকটে আছি) দ্বারা করা হয়। আর জিকরে তাহলীলে লেসানী শর্তাবলীসহ সালেককে উন্নতি দান করে এবং হুজুরও পরিদর্শন উরূজ ও নুজুল এবং অনুপ্রেরণা যেমন মাকামে কলবে ছিল এই স্থলেও হাসিল হয়। দেহ নূর সমূহের নেছবতে

বিরঞ্জিত হয়ে যায়। বরং আকর্ষণ ও মহব্বত আস্তে আস্তে সকল দেহে ছড়িয়ে পড়ে। মাকামে কালবের নেছবত এই মাকামের বর্তমান অবস্থা বাহ্যত: বিস্বাদ এবং বেমজা মনে হয়। কিন্তু যখন এই নেছবতে শক্তি অর্জিত হয়, তখন পূর্ববর্তী অবস্থাদি ভুলে যায়। এই স্থলে প্রাথমিকভাবে ফয়েজ উদ্ভবের উৎস হচ্ছে লতিফায়ে নাফস। এই মাকামকে বেলায়েতে কুবরা বলা হয়– যা আম্বিয়া (আঃ)-এর বেলায়েত।

এই বেলায়েতে আলীয়া তিনটি দায়েরা এবং একটি 'কাওস'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রথম দায়েরার নীচের অর্ধাংশ অতিরিক্ত আসমা ও সিফাতের উপর নির্ভরশীল। আর উপরস্থ অর্ধাংশ শুয়ুনাত ও মৌলিক ধর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় দায়েরা প্রথম দায়েরার নিয়মাবলীর উপর নির্ভরশীল। তৃতীয় দায়েরা এই নিয়মাবলীর সাথেই সংশ্লিষ্ট এবং 'কাওস'ও এই নীতিরই অন্তর্ভুক্ত। এই তিনটি নীতি আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে পরিগণিত হয় যে, সিফাত ও শুয়ুনাতের প্রারম্ভ হয়েছে। কবি বলেছেনঃ "মাহবুবের চেহারা প্রত্যেক আবরণের উপর একটি আবরণ রাখে, যে পর্দাকেই তুমি অতিক্রম করেছ, এর সামনে রয়েছে আরও একটি পর্দা।"

অলীর জন্য ফানায়ে হাকিকী, হাকীকতে ইসলাম ও বক্ষ সম্প্রসারণ, মাকামে দাওয়াম, শোকর ও রেজা হাসিল হলে ভাগ্যের নির্দেশের উপর মন্তব্য দূর হয়ে যায় এবং শরীয়তের কষ্টসমূহ কবুল করার মধ্যে দলীলের প্রয়োজন থাকে না। প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে যায় ও জজবার মাকামের শোরগোল হতে এতমিনান হয়ে যায় আর আল্লাহর অধীকার সমূহে বিশ্বাসের শক্তি, নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আকাঙ্খা সুদৃঢ় হয়ে উঠে। যেমন বরফ রৌদ্রে গলে যায়। তাওহীদে সিফাতী ও আমিত্ব উঠে গেলে নিজের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের উপকরণাদির অস্তিত্বকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কিত পায় এবং নিজের উপর 'আনা' (আমি) শব্দের ব্যবহারকে সহ্য করতে পারে না। আর নিজের উদ্দেশ্যকে অভিযুক্ত ও ইলজাম দেয়া এবং এমন দৃশ্যমান কসুরী রাখা যে, নিজের মধ্যে অপূর্ণতা ও কসুরী রাখা ছাড়া আর কিছুই দেখে না।

এই মাকামে আলীয়ার উপর মন্দ স্বভাব সমূহ যেমন লালসা, কৃপণতা, হিংসা, ঘৃণা, অহংকার, প্রভাবের মমত্ব, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি হতে তার নিষ্কৃতি হয়ে যায় এবং তাহজীব ও আখলাখ যা তাসাউফের সারবস্তু, তার নসীব হয়। কবি বলেছেন ঃ "মাহবুব কাকে চায়, তার মহব্বত কার সাথে হবে?"

দায়েরায়ে দাওয়াম ঃ

এতে নজরদারী ও আগ্রহের আশঙ্কা হয়। কিন্তু এখন এর অনুভূতি হয় না। কেননা, নজরদারী ও আগ্রহের অনুসারী নাফসের ফানা হয়ে গেছে। তাই এখন নজরদারী কে করবে? এই মাকামে নাফস, নাফসে মুতমাইন্না বনে যায় এবং শাহী তখতের উপর উপবেশন করে। এই মাকামে আকর্ষণ ও মহব্বতের অনুভূতি বক্ষদেশের হয়। এই মাকামের মোরাকাবা আল্লাহ্‌র দরবারে মহব্বতের দিক হতে 'ইউহিব্বুহুম্ ওয়া ইউহিব্বুনাহু'-এর উপর করা হয়। এমনকি সালেক 'বেলায়েতে উলিয়ায়' পৌঁছে যায়।

মাকামাতে কুবর এর ব্যাখ্যা ঃ

যার 'বেচুনী ও তানজিয়া'-এর মর্তবা হাসিল হয়েছে এবং আলমে মিছালে সমুপস্থিত হয়ে উপযোগী দায়েরায় পরিদৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু যেখানে আল্লাহ্ আছেন, সেখানে দায়েরার অস্তিত্ব কোথায়?

মোরাকাবায়ে ইসমে জাহের ইসমে বাতেন ঃ

বেলায়েতে উলিয়া মোরাকাবায়ে ইসমে জাহের ঃ বেলায়েতে কুবরার সকল মাকামাত অতিক্রম করা এবং "হুয়াজ জাহিরু" ইসিম-এ ভ্রমন করার পর বেলায়েতে উলিয়ার সায়র ও সুলুক শুরু হয় যা বেলায়েতে উলিয়া মালায়ে আ'লা আলাইহিস্ সালামের। এই বেলায়েতে তালেবের ব্যবহারিক ক্রিয়া মাটি ছাড়া তিনটি উপদানের সাথে হয়।

মোরাকাবায়ে ইসমে বাতেন ঃ

এই মাকামে মোরাকাবায়ে জাতে এলাহীর নাম 'হুয়াল বাতিন'-এর উপর করা হয়। এখন জিকরে তাহলীল এবং নফল প্রত্যাশীদের উন্নতি দান করা হয় এবং তাওয়াজ্জুহ, হুজুর, উরূজ ও নুজুল এখন তিনটি উপাদানে একযোগে পৌছতে থাকে এবং কখনো কখনো শরীর একচোখা চোখের মত অনুভূত হয়। এটা এমন অবস্থা হয় যা প্রারম্ভকারীদের সুলতানুল আজকার এর সময় হাসিল হয়। শরীরে তো পরিচ্ছন্নতা এসে গিয়েছিল, বর্তমান পরিচ্ছন্নতা ভিন্ন জিনিস এবং এই উপাদানের পরিচ্ছন্নতাও ভিন্ন জিনিস। এই মাকামে অবস্থাও হালতের সাথে নম্রতা ও পবিত্রতাও হাসিল হয়।

অভ্যন্তরে আশ্চর্যকর প্রশস্ততা পয়দা হয়। ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এটাও সম্ভব যে, এই মাকামে তালেবের উপর ফেরেশতা জাহের হয় এবং রাজ ও ভেদ যা প্রচ্ছন্ন থাকার উপযোগী, তা' তালেবের অনুভূত হয়ে যায়। নেয়ামতধারীদের নেয়ামত লাভ সহজ হয়ে যায়। 'হুয়াজ জাহিরু' এবং 'হুয়াল বাতিন' -এর পর তালেবকে দুই পূর্ণ মাকসুদের দিকে সায়ের করার জন্য যা স্বয়ং পবিত্র সত্তা, তা' হাসিল হয়ে যায়। যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ সামিল হয়ে যায় তবে বেলায়েতে উলিয়ার কর্মকাণ্ড সমাপ্ত করার পর 'সায়রে কামালাতে নবুওতে' উপনীত হবে।

মোরাকাবায়ে কামালাতে নবুওত ঃ

কামালাতে নবুওতের ভ্রমনে 'দায়িমি তাজাল্লিয়ে জাতি' বেপর্দা আসমাও সিফাত নসীব হয়। এই আলীশান মাকামে যার এই স্থানে এক নোকতা অতিক্রম করা সকল মাকামাতে বেলায়েত হতে উত্তম। হুজুর হয় দিকহীন এবং পূর্বের দর্শন ও তাওয়াজ্জুহ এবং প্রত্যাশার উত্তাপ এবং আগ্রহের উদ্দীপনা দূরীভূত হয়ে যায়। পূর্ণ একীন নসীব হয়। হালে মাকাম এবং মারেফাতের এখান পর্যন্ত বিস্তৃতি নেই। 'লা তুদ্‌রিকুহুল্ আবছারু' সালেকের সত্য হালের উপর সাক্ষী হয়ে যায়।

কবি বলেছেনঃ "তাঁর সৌন্দর্যের আঁচলের পাল্লা পর্যন্ত আমাদের নীচতার দ্বারা কিভাবে পৌছা যায়? তার আবরণের বুলন্দীর কারণে প্রার্থনার কাজলই কেবল পৌঁছতে পারে।" এই মাকামে প্রাপ্তি ও অনুভূতির না পৌঁছার আলামত। অকর্মন্যতা এবং নেছবতের অজ্ঞতা ও নির্মল সংযুক্তি হাসিল হয় এবং এটা উপস্থিতি কিন্তু অর্জন নয়। কবি বলেছেনঃ "বান্দাহদের সাথে আল্লাহ পাকের যে সংযোগ, তা 'বে কাইফ' ও 'বে কিয়াস' হয়।"

তালেবের সময়ের সাফাই, সাত্যিকার শান্তি এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর উপর নাজিলকৃত আহকামে ইলাহীর অনুসরণ এবং নেছবতে বাতেনের পূর্ণ প্রশস্ততা এবং অবস্থাহীনতা ও নৈরাশ্য ও অতৃপ্তি হাসিল হয়। এই স্থানে মায়ারেফ ও হাকায়েক, শরীয়তের সুরতে হয়ে থাকে। কেননা, এটা আম্বিয়া (আঃ)-এর মাকামাত এবং তা অনুসারীদের আন্তরিকতা ও ওয়ারিশ সূত্রে হাসিল হয়েছে। 'তাওহিদে ওয়াজুদী ও শুহুদী যা মায়ারেফে বেলায়েতের সম্পর্কিত ছিল, তা পথেই থেকে যায়। কিন্তু খাক লতিফা যোগসূত্রতা অনুসারে এবং তিনটি লতিফার (পানি, বাতাস, অগ্নি) এই সমষ্টি, উরূজ ও নুজুল এবং আগ্রহ সংগৃহীত হয়। এই স্থলে সম্পর্ক সূত্রে ফয়েজ বিকাশের স্থল হল লতিফায়ে খাকও সার্বিক দেহ।

এই মাকামে পবিত্র জাতের মোরাকাবা যা পূর্ববর্তী সকল অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য হতে পবিত্র হয় এবং তিলাওয়াতে কুরআন এবং নামাযে লম্বা কুনুত ও কামলাতে ছালাছা এবং হাকায়েকে ছাবআ এবং যাকিছু তার পরে পরিদৃষ্ট হবে এতে উন্নতি সাধিত হয়। এই রং হীনতা, বৈশিষ্ট্যাবলী সমুপস্থিত হয় যা বুলন্দ মর্তবা ওয়ালা মাকামাত ও আল্লাহ পাকের সত্তার সীমাহীন সমুদ্রের তরঙ্গমালা।

মোরাকাবায়ে কামালাতে রিসালাত ও কামালাতে উলুল আযম ও হাকায়েকে ছাবআ ঃ

কামালাতে রিসালাত ও কামালাতে উলুল আযম ও হাকায়েকে ছাবআ এবং পরবর্তী মাকামাতগুলোতে ফয়েজ বিকাশের স্থল, উরূজ ও নুযুল ও অনুপ্রেরণা সমস্ত শরীরকে নসীব হয়। হাইয়াতে ওয়াহদানী হচ্ছে সালেকের যা দশ লতিফার উজ্জ্বলতা ও পূর্ণতার পরে হাসিল হয়েছে। কবি বলেছেনঃ "এটা হচ্ছে দৌলতের কাজ, এখন কে ইহা পর্যন্ত পৌছুতে পারে?"

মোরাকাবায়ে হাকীকতে কাবা, হাকিকতে কুরআন মাজীদ, হাকীকতে সালাত ঃ

জাতে এলাহীর আজমত ও কিবরিয়াই-এর গোপন ভেদ প্রকাশের রহস্যই হচ্ছে হাকিকতে কাবা। হাকিকতে কোরআন আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র সত্তার প্রশস্ততার উচ্চতর প্রারম্ভ। হাকিকতে সালাত আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তার উচ্চতর মর্যাদার চূড়ান্ত পূর্ণতা। হযরত মুজাদ্দেদ কুদ্দেসা সিররুহুর কালাম থেকে বুঝা যায় যে, 'মাকামে মাবুদিয়াতে ছারফা যা হাকিকতে সালাতের পর সমুপস্থিত হয় তা আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তার সীমাহীন শীর্ষস্থল মাত্র, যা নসীব হলে আল্লাহ্র মকবুল বান্দাহগণ তাঁর বারগাহে পৌঁছে যায় এবং 'দায়েরায়ে

কাইয়্যুমিয়াতে' পৌঁছে যায় এবং সেই সত্তার সান্নিধ্য অর্জিত হয়। আবদিয়াতের মাকামাত এবং এই হাকিকতগুলোর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সায়রে কদমী ও সুলুক পূর্ণ হয়ে যায়।

মোরাকাবায়ে মা'বুদিয়াতে ছারফা ও হাকিকতে ইব্রাহীমী ঃ

এরপর হচ্ছে মা'বুদিয়াতে ছারফা। এই স্থান সায়রে কদমীকে নিষেধ করে এবং সায়রে নজরীকে বৈধ রাখে। মাকামে খুল্লাত হাকিকতে ইব্রাহিমী (আঃ)। ঐ মাকাম খুবই বড় ও অধিক বরকত পূর্ণ। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) এ মাকামে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অধীনস্ত। আর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাবীবুর রহমান যিনি মিল্লাতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর নির্দেশের উপর চালিত হয়েছেন। তাই সালাত এবং প্রত্যাশিত বরকতসমূহে নিজেকে সালাতে ইব্রাহিমীর সাথে উপমা প্রদান করেছেন, যা দরূদে ইব্রাহিমীতে বিবৃত হয়েছে। তবে এখানে বুলন্দ মাকামের খায়ের ও বরকত বুঝে নিতে হবে।

মোরাকাবায়ে হাকিকতে মুসাভী ঃ

এই মাকামের মারকাব্য 'মুহিব্বিয়াতে ছারফা জাতিয়া' হাকিকতে মূসা (আঃ)। অনেক পয়গাম্বর তাঁর অনুসরণের দ্বারা এই মাকামে উপনীত হয়েছেন এবং ইলাহীর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

মোরাকাবায়ে হাকিকতে মোহাম্মাদী (সাঃ) ঃ

এই মাকামের মারকাজকে কাশফের সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে একটি বৃহৎ দায়েরা পরিদৃষ্ট হয়। আর এই দায়েরা 'মুহিব্বিয়াত ও মাহবুবিয়াতে সৌভাগ্যশীলদের মারকাজ হাকিকতে মোহাম্মাদী (সাঃ)। মনে হয় মোহাম্মাদ নাম মোবারকের দু'টি 'মীম' এই মুহিব্বিয়াত ও মাহবুবিয়াতের দিকে ইশারা করছে। বস্তুত: এই মারকাজের মধ্যে গভীর দৃষ্টিতে তাকালে একটি উচ্চতর শানবিশিষ্ট দায়েরার উদাহরণ দৃষ্টি গোচর হয়।

মোরাকাবায়ে হাকীকতে আহমাদী (সাঃ) ঃ

এই দায়েরার মারকাজ 'মাহবুবিয়াতে ছারফা জাতিয়া' হাকীকতে আহমাদী (সাঃ)। এই পবিত্র "আহমাদ" নামের 'মীম' এই রহস্যকেই উন্মোচন করে। জেনে রাখ, এই আজমত ও কিবিরিয়াই এবং এই প্রশস্ততা এবং এই মহব্বত এবং তার মর্যাদাগুলো হতে পারে যে, তা হযরতের সত্তায় রয়েছে। এই মর্যদার অর্জন হয় তাজাল্লিয়াতে জাতি দায়েমী হাসিল হওয়ার পর, যাদের অর্জন কামালাতে নবুওতের মধ্যে হয়, তা তাদের সামনে এসে যায়। মর্যাদাশীল ও সুবিস্তৃত হওয়া এবং স্বীয় মুহিব্ব ও মাহবুব হওয়ার তাহকীক অন্যের দিকে সম্বন্ধ করার উপর নির্ভরশীল নয়। শুধু পবিত্র ও মহান সত্তা আল্লাহ্ পাকের চেহারা ও বৈশিষ্টাবলী মাত্র। তাছাড়া মহব্বতের লক্ষ্য যা জেলাল ও সিফাতের সায়েরের মধ্যে পয়দা হয়, তা আন্তরিক আগ্রহ ও উদ্দীপনা। আর যে মহব্বত এই মাকামাতে শুধু আল্লাহ্র অনুগ্রহে নসীব হয়, পূর্ণ

প্রশান্তি ও প্রশস্ততা, রং হীন বাতেন ও এবাদতের ইচ্ছা, সঠিক থাকা ও সতর্কতা লাভ করা মাহবুবের অনুগ্রহের কারণ হয়ে দাড়ায়।

সুতরাং এই মাকামাতে উপনীত পুণ্যত্মাদের সাক্ষ্য এই অর্থের সত্যতা প্রতিপন্ন করে। পূর্ণতার ক্ষেত্রে এই অর্থের অর্জন পূর্ববর্তী মাকামাতেও হতে পারে। এই মাকামের সুনির্দিষ্ট পৃথককারী এবং বৈশিষ্ট্যাবলী কি হবে? বরং ইনসাফ এটাই যে, প্রত্যেক মাকামের সুনির্দিষ্ট নিদর্শনাদি যা অন্যের মোটেই হাসিল হয় না এবং সকলকে যারা এই মাকামে সামিল আছে, তারা প্রমাণ সাপেক্ষে এই মাকাম অর্জন করতে পারে। এই আশাও না করা চাই। আর যদি 'সিফাতে জাতিয়া' হয় এবং যে প্রথম দরজায়ে বেলায়েতে কুবরাকে অতিক্রম করে তার দ্রুত ফিরে আসা অবধারিত হয়ে যায়। সুতরাং চিন্তা করা উচিত।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, হাকিকতে মোহাম্মাদী (সাঃ) ও হাকিকতে আহমাদী (সাঃ) আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্তার অধিক নিকটতর। এটাই কারণ যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাহবুবানদের সর্দার বনে গেছেন এবং তাঁর অধীনস্ত ব্যক্তিগণ 'উত্তম উম্মত' হয়ে গেছেন। হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদেরকে আপনার মহব্বত দান করুন এবং স্বীয় রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর মহব্বত ও এত্তেবা এবং শাফায়াত নসীব করুন এবং স্বীয় রেজামন্দি ও আপনার মাহবুবে আকরাম (সাঃ)-এর সন্তুষ্টি প্রদান করুন।

মোরাকাবায়ে হুবেব ছরফ ও লা তায়ায়্যুন ঃ

এরপর হচ্ছে লা তায়ায়্যুন। এখানে সায়রে কদমী নিষিদ্ধ কিন্তু সায়রে নজবী সিদ্ধ।

জেনে রাখ, হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ)-এর নিকট প্রথম তায়ায়্যুন হচ্ছে তায়ায়্যুনে হুব্বি। এই তায়ায়্যুনে হুব্বের মারকাজ, মাহবুবিয়াতে হাকিকতে আহমাদিয়ার হিসেবে হয়। আর তা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর তায়ায়্যুনে রূহী ও মালাকী। মাহবুবিয়াত ও মুহিব্বিয়াতে উপনীতদের মূল্যমান অনুসারে হাকীকতে মোহাম্মাদী (সাঃ)। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তায়ায়্যুনে জাসাদী ও বাশারী। মুহিব্বিয়াতে ছারফা হিসেবে হাকীকতে মূসাভী এবং তায়ায়্যুনে মূসা (আঃ)। এই মারকাজের পরিবেষ্টনী যা দায়েরার মত, তা ছুরতে মিছালে খুল্লাত ও বন্ধুত্ব। এই খুল্লাত হচ্ছে হাকিকতে ইব্রাহীমী (আঃ)।

তায়ায়্যুনে সানী ঃ

তায়ায়্যুনে সানী তায়ায়্যুনে অজুদী এবং প্রথম তায়ায়্যুনের ছায়ার মত। এটা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর তায়ায়্যুন। আর এই তায়ায়্যুন অজুদীর অংশগুলো হতে প্রত্যেক পয়গম্বর এবং রাসূলের প্রারম্ভ। তায়ায়্যুন একটি অংশ। উম্মতদের মধ্য হতে যদি কারও আম্বিয়াদের অনুসরণের বরকতে এই তায়ায়্যুনে অজুদী নসীব হয়ে যায় এবং এই তায়ায়্যুনের অংশ বা বিন্দু এই ব্যক্তির তায়ায়্যুনের প্রারম্ভ হয়ে যায়, তবে তা বৈধ হবে। বরং প্রকৃতই হবে। উপর স্তরের ফেরেশতাগণের প্রারম্ভিক তায়ায়্যুনাত ও এই তায়ায়্যুনের অস্তিত্বের মধ্যে গণ্য। আর

আমিরুল মুমেনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর হাকিতের প্রারম্ভ কোন নির্দেশের মাধ্যম ছাড়াই হাকিকতে মোহাম্মাদীর এই প্রকারের ছায়া যে, যা কিছু এই হাকিকতের সাথে সংযুক্ত তা-ই অধীনতা ও উত্তরাধিকার সূত্রে এই ছায়াতে অবস্থিত ও প্রতিষ্ঠিত। এখানেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্ব হাসিল ছিল যিনি রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পূর্ণ মহব্বত ও সান্নিধ্যের আওতায় আল্লাহ্র নৈকট্যের মাকামাতের পরিভ্রমণ করতেন। এজন্য হাদীসে এসেছে, যে বস্তু আল্লাহ্ তায়ালা আমার বক্ষে অর্পণ করেছেন, তা আবু বকরের বক্ষে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। এই উচ্চতর মর্যাদা শায়খুশ্ শুয়ুখ হযরত মোহাম্মদ আবেদ-এর অধীনস্ততা ও উত্তরাধিকার সূত্রে হাসিল হয়েছিল। শায়খ মোহাম্মদ আবেদ (রহঃ) আমাদের হযরত মির্জা মাজহার জান জানানকে স্বীয় প্রতিনিধি বানিয়ে গৌরবান্বিত করেছিলেন। একদিন হযরত শায়খ মোহাম্মদ আবেদ (রহঃ) বললেন, আজ রাত্রে আল্লাহ্ তায়ালা নতুন নেছবতে আমাকে গৌরবান্বিত করেছেন। হযরত মির্জা মাজহার জান জানান আরজ করলেন- আপনি এই নেয়ামত অমুক সময় লাভ করেছেন। হযরত শায়খ মোহাম্মদ আবেদ (রহঃ) বললেন, হ্যাঁ, তুমি আমার প্রতিনিধি। আর তোমাকেও এই দৌলত দ্বারা মর্যাদাবান করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক কবুল করুন এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের হাকিকতের মধ্যে সঠিক কাশ্ফ ও অবস্থার অনুভূতি, অধিক মাকামাত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরিজনদের রূহ মোবারকের বরজাখীয়াতের সাথে যাদের হাকিকতের সম্মিলন ঘটেছে, তা উন্নতী প্রদায়কও বটে।

অথবা এই দরূদ শরীফের স্থলে ঐ দরূদ শরীফ যা নকশেবন্দে আছে তিন হাজার বার পাঠ করবে। এই মাকামাতে নেছবতের আনওয়ার এবং সেই আকাবের আলাইহমুস সালাত ও তাসলিমাতের পবিত্র আরওয়াহের আবির্ভাব হয় এবং ঈমানিয়াতের মধ্যে ঈমানের শক্তি বেড়ে যায়।

জেনে রাখ যে, এই তিন বেলায়েত এবং এই তিন কামালাত ও হাকায়েকে ছাবআ ও অন্যান্য মাকামাত যে গুলো সম্পর্কে এই পৃষ্ঠাগুলোতে সেই সমুদ্রগুলোর কিছু স্মৃতি ঢেলে দেয়া হয়েছে, এই খান্দানের সকল অনুসারীগণের তা হাসিল হয়নি। কেউ বেলায়েতে কলবী বরং দায়েরায়ে এমকান পর্যন্ত পৌছেছে। কেউ বেলায়েতে কুবরা পর্যন্ত তিনটি কামালাতের স্বল্প স্তরে সৌভাগ্যশালী হয়েছে। বহু সংখ্যক কম লোক 'হাকায়েকে ছাবআ' ও অন্যান্য গুলোর উপর কামিয়াব হয়েছে। এটাই কারণ যে, এই খান্দানের সকল মুরীদানের হালত এবং তাছির পৃথক পৃথক ও প্রত্যেক মাকামের হালত ও জ্ঞান আলাদা আলাদা। যেমনটি প্রথমে নমুনা স্বরূপ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মোটকথা বেলায়েতের মধ্যে বিশেষ করে বেলায়েতে কলবিয়ার মধ্যে জওক শওক ও উত্তাপের সাথে হালাত প্রকাশ পায়। কামালাতে নবুওত ও হাকায়েকে ছাবআ-এর মধ্যে পরিচ্ছন্ন একাগ্রতা ও রং হীন কমনীয়তা পয়দা হয়। এই স্থানে তাজাল্লিয়াতে জাতিয়ায় বেপর্দা আসমা ও সিফাত প্রকাশ পায়। (যেমন তার অধিকারীর নিকট অজানা নয়)। সকল মাকামাত ও নকশেবন্দিয়ার বিস্তৃত বিবরণ মোজাদ্দেদে আলফে সানীর মাকতুবাতে সন্নিবেশিত আছে। কার্যত: এই কামালাতে ছালাছা এবং হাকায়েকের মধ্যে কথা

বলা একটি রেওয়াজ থেকে বেশী কিছু নয়। যোগ্যতা কোথায় এবং কার এই বুলন্দ মাকামাতের অভিজ্ঞতা আছে? কবি বলেছেনঃ "এটা ভুল যে, যে মাথা মুণ্ডন করেছে, সে কলন্দর বনে গেছে। আর এটাও ভুল যে, যে আয়না রাখে সে সেকান্দরীও জানে?

এই খান্দানের প্রচলিত বেশারত সেগুলোর নিদর্শন ও আলামতের তাহকীক ছাড়া সালেকের জাহের এবং বাতেনের মধ্যে শোনার মত ও ধর্তব্যের মত কিছু নেই। কবি বলেছেনঃ "কিন্তু একটি ইদুর স্বপ্নে উট বনে গেছে।"

এটা যে তাসাউফে মশহুর হয়ে আছে যে, তালেবের জন্য এই অবস্থাদির এলেম হওয়া জরুরী নয়। যদি এলেমও হয়, তবে সেই এলেম দ্বারা মুরাদ হল হালতের বিস্তৃতি এবং কাশফের আহওয়াল। যদি কার্যত: তালেবের বাতেনের মধ্যে বিভিন্ন হালাতের বিকাশের দ্বারা কোন পরিবর্তন না হয়, কোন পরিবর্তন অনুভব না করে; তারপরও তালেবের জন্য জরুরী যে, নির্ভরতা ও দাওয়ামে নেগরানী, ফানায়ে হাওয়া, ফানায়ে এরাদা, ফানায়ে আনা জরুরী। হযরত মির্জা সাহেব বলতেন এবং এন্তেকালের পূর্বে বলেছিলেন যে, মুজাদ্দেদিয়ার সকল মাকামাত-এর মোকাম্মাল সুলুক অতিসত্বর বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন– সারাবিশ্বে এমন কোন লোক দেখা যায় না, যাকে এই সকল মাকামাত অতিক্রম করানোর শক্তি নসীব হবে। মোহাম্মদ এহসান রওজাতুল কাইয়্যুমীয়ার হাজারাতে মুজাদ্দেদিয়ার মানাকেব লিখতে গিয়ে এই মর্মকে ব্যক্ত করেছেন।

সুতরাং বেলায়েতের অনুরাগ ও অবস্থাদি এবং কামালাতে নবুওত এবং অন্যান্য মাকামাতের রং হীনতা ও প্রশস্ততা মাকামাত হাসিলের জন্য যথেষ্ট ও সত্য সাক্ষী। ধ্যান-ধারণার দ্বারা কি হয়? মূল্যহীন বেশারতের দ্বারা অহঙ্কারী বানানো এবং মানুষকে গীবতে নিপতিত করার কোনই ফায়দা নেই। কিন্তু ফায়দা হচ্ছে জাহেরকে সুন্নতের পায়রবী দ্বারা সাজানো এবং বাতেনকে দাওয়ামে হুজুর ও আল্লাহর দিকে অনুরক্ত ও আলোকিত করার মধ্যে।

দরবেশী ঃ

দরবেশী কি? একই হালের উপর জিন্দেগী অতিবাহিত করা এবং একই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। কবি বলেছেন ঃ "তুমি নিজের ইচ্ছা সমূহ ও খাহেশাতের হাতে খোদ পরস্তির মধ্যে নিমগ্ন, কি ভাল হত যদি তোমার মির্জা মাজহার জান জানান (রহঃ)-এর মত আল্লাহ্‌র দিকে পৌঁছার রাস্তা মিলে যেত এবং 'মাছাওয়া'-এর বন্দীশালা হতে মুক্তি লাভ ঘটত।"

সালেকগণের ফানায়ে কলবকে তাওহীদে অজুদী, পরিবেষ্টনী ও প্রশস্ততা যা সময়াদি বিনির্মাণের জন্য উবুদিয়াতের ওয়াজিফা সমূহ অধিক জিকিরের দ্বারা হযরত মাশায়েখে কেরামের তরবিয়তের মাধ্যমে জযবা, ছোকর, মস্তি, মহব্বতের আধিক্য ও তাজাল্লিয়ে বারকীর মাকাম হতে যা অর্জিত হয়েছে তা সমুপস্থিত হয়। কিন্তু সেই তাওহীদ যা শুধু অজুদে

হামাউস্ত এর মোরাকাবার আনন্দ এবং তিনি মওজুদ বলে ধারণা হয়, তা ধারণার প্রাবল্য বৈ কিছুই নয় এবং ধর্তব্যও নয়।

তাওহীদে শুহুদী ঃ

ফানায়ে নাফসের অধিকারীর তাওহীদে শুহুদীর জ্ঞান যা সে ফানায়ে কলব অর্জনের পর সত্য নূরের আওতায় আসা ও অস্তিত্বের উপসর্গ ও বিলুপ্তির মাধ্যমে লাভ করে, তা কামালাতে নবুওত অন্যান্য মাকামাতে মুজাদ্দেদিয়ার মধ্যে তাজাল্লিয়ে জাতীর প্রত্যাশীর বিকাশস্থল। ছোকর শেষ হয়ে গেছে, এমন স্বচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে এবং সচেতনতা এসেছে। এ হচ্ছে শরয়ী হুকুমের হাকায়েক ও মায়ারেফ মাত্র।

যে সালেকীন তাওহীদে অজুদীর মাকামে রয়েছে সে আল্লাহ্ পাকের সাথে সারা বিশ্বের সম্পর্কের একত্বতা ও সত্যতা প্রতিষ্ঠা করে। তাওহীদে শুহুদীর অধিকারীগণ আল্লাহ্ পাকের বিশ্বের সাথে ছায়ার সম্পর্ক স্থির হওয়াকে নির্ধারণ করেন। যারা এই উভয়কে অতিক্রম করেছেন (তাওহীদে শুহুদী ও তাওহীদে অজুদী) এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসরণ ও উত্তরাধিকারের দ্বারা কামালাতে নবুওত হাসিল করেছেন তারা মাকসুদের চূড়ান্ত পবিত্রতার দরুন এর প্রত্যেক নেছবত প্রতিষ্ঠায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু শুধু নেছবতে মাখলুকিয়াত ও মাছনুইয়াত এই মারেফাত আবেগী ও প্রেরণা সূলভ হয়, তাকলিদী হয় না। কিন্তু জ্ঞানের এই শ্রেণীগুলোর বিকাশ সকল সালেকের লভ্য হয় না। মাটির পুতুল শানে রাবুবিয়াত পর্যন্ত কি করে পৌছুতে পারে? এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাকে চান দান করেন, অবশ্যই আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল। কবি বলেছেনঃ "মাটির পুতুলের রাব্বুল আরবাবের সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে?" আইনত: সম্ভব যে সালেক তিনটি বেলায়েত ও কামালাতে নবুওতে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। কিন্তু এ সকল জ্ঞানের কিছুই তাদের উপর প্রকাশ পায় না। কবি বলেছেন ঃ "সুলতান প্রত্যেক লোকের ক্রেতা নহেন, আর সকল গালীম পরিধানকারীই প্রকৃত সালেক নহেন।"

সায়ের ও সুলুকের সারবস্তু ঃ

কিন্তু সায়ের ও সুলুকের সারবস্তু হল, ফানা ও দাওয়ামে হুজুর ও নৈতিক শিষ্টাচার, পূর্ণ-এখলাস এবং আহকামে শরীয়তের অনুকরণের মধ্যে কষ্ট দূরীভূত হওয়া। তাওহীদের গোপন রহস্য প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে অপর হালাতের সাথে অর্জিত হওয়াও সম্ভব। হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী নেছবতে নকশেবন্দীয়া এখতিয়ার করেছিলেন। এই নেছবত শরীয়তের নূরে বিরঞ্জিত।

নেছবত এহরারিয়া ঃ

খাজা এহরার (রহঃ) নেছবতে এহরারিয়া স্বীয় পিতৃ পুরুষদের থেকে হাসিল করেছিলেন। এর উদ্দেশ্যে হলো 'আস্রারে তাওহীদে অজুদী'। কিন্তু তিনি তা পরিত্যাগ করেন। এই

তাওহীদের মধ্যে অধিকাংশ সালেকীনের কদম পিছলে যায়। প্রত্যেক যুগে অধিকাংশ সালেকীন তাসাউফের সঠিক প্রেরণা এবং সঠিক অনুভূতির সাথে পরিচিতই নয়। এর কারণগুলো এইঃ (১) নবী (সা.)-এর জমানার দূরত্ব, (২) কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়া, (৩) সামর্থের অভাব। (জেনে রাখা ভাল) যে সকল মায়ারেফ বুযুর্গানে দ্বীন বায়ান করেছেন, সবই সত্য। যার যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে সে প্রকাশ্যে বলে দিয়েছে। মায়ারেফের বর্ণনায় বিভিন্নতার কারণ এই নয় যে, খোদা নাখাস্তা কেউ মিথ্যা বলেছেন। বরং তার কারণ সালেকীনদের পথ এবং মাকামাতের বিভিন্নতা। এখানে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। কারও জন্য বৈধ হবে না যে সত্যবাদীদেরকে মিথ্যার সাথে সম্পৃক্ত করা।

ওয়াজুদিয়া পন্থীরা আহলে তাওহীদকে ভুলে নিপতিত বলেন। তারা বলেন– "কেউ মনে করে তাওহীদ শুহুদী, ওয়াজুদী নয়। তারা হাকিকতের মাকামে পৌছতে পারেনি। এর কারণ হচ্ছে এই যে, ওয়াজুদিয়াদের মধ্যে এই সকল মাকামাতের পরিচয়ই ঘটেনি, যেখানে তাওহীদে শুহুদীর জ্ঞান বিকশিত হয়। এজন্য তারা তাওহীদে শুহুদিকে ক্লেদাক্ত করে।

কিন্তু তাওহীদে শুহুদী কুরআনের নির্দেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কামেল সালেকীনগণ যারা ছাকার হতে বিমুক্ত ও সতর্কতার মাকামের দ্বারা সৌভাগ্যশালী হয়েছে এবং মাশরাবে আম্বিয়া (আঃ) হতে মর্যাদাবান হয়েছে। তাদের কাশফ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই সব বুযুর্গগণ তাওহীদে শুহুদীর পরিচয় লাভ করেছে এবং এই মাকাম হতে বড় অংশ হাসিল করেছে। কেউ কি শুনেছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যারা সকল আউলিয়া হতে উত্তম কখনো 'হামাউস্ত' বলেছেন? এবং তাওহীদে ওয়জুদীর উল্লেখ করেছেন?

আকাবেরদের বিভিন্ন বক্তব্যের মর্ম স্বীয় মাশারাব (তরীকা ও অনুভবের প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা) অনুসারে বর্ণনা করা হালের প্রভাবের পরিচায়ক। এভাবে কিয়াস করে নিন। এভাবে বিভিন্ন মাশারেবের পরস্পর সংহতিমূলক এবারতের ব্যাখ্যা জোরে শোরে করা হয়েছে। যেন মধ্যকার এখতেলাফ দূর হয়ে যায়। এছাড়া পরস্পর সাংঘর্ষিক এবং বিভিন্ন মাকামাতের একাত্মতা কিভাবে সম্ভব? যদি বিভিন্ন এবারতের সংহতি ব্যাখ্যার দ্বারা করাও হয় তারপরও বিভিন্ন মাকামাতের হালাত ও আগ্রহ এক কিভাবে হতে পারে?

যদি তুমি বল যে, শীতকাল এবং গরমকালের বাতাসের বাতাসী মৌলিকত্ব এক। কিন্তু পুনরায় প্রশ্নের উদয় হয় যে, এই উভয় বাতাসের উত্তাপ ও শীতলতা এক করা যায় না। এ সত্ত্বেও প্রত্যেক মাকামের উলুম ও মায়ারেফ পৃথক পৃথক হয়। প্রত্যেক মর্তবার আনওয়ার ও ফুয়ুজ ভিন্ন ভিন্ন হয়। সুতরাং এ সকল সংহতি স্থাপন কথার চাতুরীর দ্বারা হয়, হালের আকাঙ্খার প্রবল্যের দ্বারা নয়। জ্ঞান আল্লাহ্‌র নিকটে। এই আকাবের বুযুর্গদের লেখনী ও বিবৃতির উপর কথা বলা আমার মত উপাদানহীনের সাধ্যের বাইরের ব্যাপার। কবি বলেছেনঃ "কামিনা মানুষ দরবেশদের কথা চুরি করে, যেন কোনও শান্তিপ্রিয় লোকের উপর তার প্রতিক্রিয়া পতিত হয়।" কিন্তু যেহেতু এই মিসকীনের আহওয়ালে বুযুর্গানের পিপাসা রয়েছে,

সুতরাং সেই আকাবেরদের কিছু কথা লিপিবদ্ধ করছি। হয়ত আল্লাহ পাক আমাকে সামর্থ প্রদান করবেন। কবি বলেছেনঃ "যদি আমি মিষ্টির নামের সাথে পরিচিত না হই, তাহলে উত্তম হবে মুখে বিষ ঢুকিয়ে দেয়া।"

সিফতে সুলুক ঃ

যদি কোন তালেবে এলেম বয়আতের জন্য আগমন করে তাহলে মোর্শেদের জন্য পবিত্র হাদীস মোতাবেক বারবার এস্তেখারা করা জরুরী। অথবা যদি এস্তেখারা করতে না পারে, তাহলে মনের সাক্ষ্য চাইবে। এটাও যথেষ্ট। আর এতে পরস্পরের ফুয়ূজের মধ্যে একাত্মতা ছাড়া ফায়দা মঞ্জুর হয় না। আর এভাবে এর উপর ফায়দা আরোপিত হবে।

তারপর মোর্শেদ মুরীদকে তাওবাহ ও এস্তেগফারের তালকীন করবে। ইসমেজাত জিকিরের তরীকা বলে দিবে, তাওয়াজ্জু করবে এবং মুরীদের দিলকে নিজের দিলের বিপরীত রেখে হিম্মত দান করবে এবং তার দিলের উপর জিকির এলকা করবে। যেন তার দিল জাকের হয়ে যায় এবং এতে হরকত পয়দা হয়।

যদি কারও দিল এলকায়ে জিকির দ্বারা প্রভাবিত না হয়, তবে তাকে অকুফে কলবীতে মশগুল করা চাই। এভাবে লতিফায়ে কলব জারী হওয়ার পর মোর্শেদ মুরীদের প্রত্যেক লতিফার উপর পর্যায়ক্রমে তাওয়াজ্জু করবে এবং এলকায়ে জিকির করবে। প্রত্যেক লতিফার দিকে পৃথক পৃথকভাবে কয়েকদিন তাওয়াজ্জু করবে। যেন সাতটি লতিফা আল্লাহ্‌র ফজলে জিকিরে মশগুল হয়ে যায়।

তারপর শায়খ মুরীদকে নফী এসবাতের জিকিরের তালকীন করবে এবং মোরাকাবায়ে আহাদিয়াতে ছরকা তাকে বলে দিবে এবং সর্বদা মুরীদদের দিলের উপর তার আনওয়ার এলকা করবে, যে নেছবত শায়খকে বুযুর্গদের উত্তরাধিকার সূত্রে মিলেছে। উপর হতে জযবা ইনশাআল্লাহ জাহের হবে। এভাবে কয়েক দিনের মধ্যেই সালেকের দিল নূরানী হয়ে যাবে। এরই আওতায় অন্যান্য লতিফা ও নূরে বিরঞ্জিত হয়ে যাবে।

কলবের নূরের রং হলদে, রূহের নূরের রং লাল, ছির-এর নূরের রং সাদা, লতিফায়ে খফীর নূরের রং কালো, লতিফায়ে আখফার নূরের রং সবুজ, লতিফায়ে নাফস রং হীন। আর এ সকল আনওয়ারের রং সালেকের অভ্যন্তরে প্রতিবিম্বিত হয়।

স্মরণ রাখা চাই যে, আনওয়ারগুলো দেখা মূল মাকসুদ নয়। মানুষের বাইরে কায়েনাতে কি কম আনওয়ার আছে যে, মানুষ বাতেনী আনওয়ারের তামাশায় লেগে যাবে। স্বপ্ন এবং ঘটনাবলী খোশ খবরী ছাড়া কোন হাকিকতই রাখে না। কবি বলেছেন ঃ "না আমি রাত, না রাতের পূজারী যে স্বপ্নের কথা বলব? যখন আমি সূর্যের গোলাম, তখন সবকিছু সূর্যের কাছেই বলি।"

আল্লাহর দীদার ও রাসূল (সাঃ)-এর যিয়ারত ঃ

দীদার - যিয়ারত - কাশফ ঃ

উচ্চতর ঘটনাবলীর মধ্যে আল্লাহর দীদার এবং যিয়ারতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)। যদি খেয়াল ও ধারণা হতে বিমুক্ত হয়। হাকিকতের ধারনা হতে সন্দেহের কারণ এই যে, জিকিরের আনওয়ারের চমক অথবা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে মহব্বত, এখলাস অথবা উপযোগী সামর্থ অথবা মোর্শেদের সন্তুষ্টি অথবা তার বাতেনী নেছবত অথবা অধিক দরূদ পাঠ অথবা কোন আসমা পাঠ করা, অথবা সুন্নাতকে জিন্দা করা অথবা বিদআতকে পরিত্যাগ করা, অথবা মুরুব্বিদের খেদমত করা অথবা হাদীসের এলেমে সামগ্রিক আত্মনিয়োগ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ছুরত মোবারকের মধ্যে পরিচিত্রিত হয়। মানুষ মনে করে যে, যিয়ারতের মর্যাদায় অভিসিক্ত হয়ে গেছে। আসলে তা নয়। বরং সেই রহমতের দরিয়ার স্রোত ধারায় পরিতৃপ্ত হয়েছে। এটাই কারণ যে, বিভিন্ন ছুরতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে মানুষ দেখে। যদি সেই ছুরত যা মদীনা মুনাওয়ারায় মওজুদ আছে, শামায়েলে একে বয়ান করেছেন। দেখা তো সৌভাগ্য এবং বাতেনের তারাক্কি এবং তাওফিক পরিবর্ধনের পরিচায়ক হয়। অন্যথায় দিল ধারণা ও খেয়ালের দ্বারা খুশী হয়। আর এভাবেই মাশায়েখে কেরামের পবিত্র রূহগুলোর যিয়ারতকে কিয়াস করুন। এভাবেই কাশফ-এর জন্য নিয়তের শুদ্ধতা বড় ওজর হয়ে থাকে।

নিজের ভক্ত ও অনুরক্তকে অথবা মানুষের মধ্যে বিস্তৃত মশহুর খবরকে অথবা ওমরের বিষয়াদি, বিষয়াদি সূরতে, যায়েদিয়া শয়তানী এলকা অথবা হাওয়ায়ে নফসানী খেয়ালের আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়। মানুষ মনে করে ওমরের ছুরতকে আলমে মিছালে দেখেছে, কিন্তু কখনও এ কাজ অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্তাবলী জানে না, তাই এভাবে ভুল ঘটে যায়।

সুতরাং রেজা ও তাসলিমের পথকে সামনে রেখে একক আল্লাহ্র দিকে মুতাওয়াজ্জু হয়ে যাওয়া চাই। এতে মশগুল না হওয়া চাই। "আমি আমার সকল কাজ আল্লাহ্ তায়ালাকে সোপর্দ করছি নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাহদেরকে দেখছেন।" (আল-কুরআন) আর চেষ্টা করা চাই, পরিশ্রম করা চাই, যেন মাকসুদ হাসিল হয়ে যায়। ঐ শুহুদ যা প্রাণ ও দেহের গ্রেপ্তারীর পূর্বে হাসিল ছিল এবং তাকে শারীরিক অন্ধকারে হারিয়ে দেয়া হয়েছিল, তা প্রকাশ করে দেয়া চাই। যে কাউকে কাশফ এনায়েত করা হয়, সে নিজের আনওয়ার ও সায়েরকে দৃষ্টিশক্তির দ্বারা পরিদর্শন করে। অন্যথায় মনের একাগ্রতা তাওয়াজ্জু, কলব ও ফাইয়্যাজের পরিদর্শন শুরু থেকেই ক্রমাগতভাবে তারাক্কী লাভ করে। অল্প সময়ে লতিফায়ে কলব আলোকিত হয়ে দেহ কাঠামো হতে বাইরে চলে আসে। অনুভবকারীদের আগ্রহ ও আকর্ষণের দ্বারা লতিফাগুলোর অনুভব হয়ে যায়। কেননা, সুলুক গমন করার নাম। গমন আগ্রহের সহচর। যখন লতিফায়ে কলব দেহ হতে বাইরে চলে আসে, তখন কারও কলবের উপর প্রশস্ত রাস্তা, কারও নূরের কোব্বা মাথার উপর দাঁড়ানো অনুভূত হয়।

সালেকের উপর কখনো 'উরূজের' হালত আপতিত হয়, কলব উপরের দিকে দ্রুত চলে যেতে থাকে। কখনো 'নুজুলের' হালত আপতিত হয় যে কলব নীচের দিকে ধাবিত বলে অনুভূত হয় (আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এমনটি হয়)। সালেক লতিফায়ে কলবকে স্বীয় কলবের মুলের মধ্যে যাকে 'কলবে কাবীর' এবং 'হাকিকতে জামেয়ায়ে ইনসানী বলে এবং যা আরশে মজিদের সঙ্গে যুক্ত ও একত্রিত পায়। সালেককে এই মাকামে এই খেয়াল করা চাই যে, এখন তার ফানায়ে কলব হাসিল হয়ে গেছে। এটা কাশফের ভুল বুঝাবুঝি। এই মাকাম পর্যন্ত তো দায়েরায়ে এমকানের অর্ধেক আলমে আমরের সায়েরের সাথে যুক্ত এবং বস্তুহীনতার সাথে অভিসিক্ত, তা এখনো বাকী রয়েছে।

দায়েরায়ে এমকানের সায়ের শেষ হওয়ার পর বেলায়েতে ছোগরার মধ্যে কলবের ফানার ছুরত হাসিল হয়, যে ব্যক্তি ভুল কাশফের দ্বারা কলবে কবীর পর্যন্ত পৌছাকে ফানা হাসিল হওয়া ও লাতায়েফে এই সায়রকে বেলায়েতে কুবরা এবং ফানায়ে নাফস মনে করে, তাহলে সুস্পষ্ট যে এর অধিকারীদের এই অবস্থা ও আকর্ষণ এবং অন্যান্য আকর্ষণ যা বেলায়েতে ছোগরাতে উপস্থিত হয় এবং এই বেলায়েতে পৌঁছা বেলায়েতে কুবরা অর্জনের শর্ত, তবে তার কি হাসিল হবে? শুধু পাহাড়ে হারিয়ে যাওয়ার দিন গুজরানী করেছে মাত্র। কিসের ফানা এবং বেলায়েত কোথায়? আল্লাহ্ তায়ালা তার উদ্দেশ্যকে স্বীয় অফুরন্ত অনুগ্রহের দ্বারা তাহকীকধারীদের মাকামাত পর্যন্ত পৌঁছে দিন, আমীন।

যখন আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ শামেলে হাল হয়ে যায় এবং শায়খে কামেলের তাওয়াজ্জু নসীব হয়, তখন দায়েরায়ে এসকানের দুটি 'কাওস'-এর সায়ের পুরা হয়ে যায় এবং সালেকের এই সায়ের সমাপ্তির ঠিকানা সুস্পষ্ট কাশফ অথবা সুস্পষ্ট প্রাপ্তির মাধ্যমে হয়। এই মাকাম অর্জনের বাহ্যিক আলামত এই যে, সালেকের আল্লাহ পাকের দরবারে সার্বিক হাজিরী নসীব হয়। জাগরণে ও স্বপ্নে দাওয়াম হুজুর মায়াল্লাহ নসীব হয়। বেলায়েতে ছোগরার অন্যান্য হালাতের অবস্থাদি এবং শাক্তিশালী আকর্ষণও এর আলামত। তখন অন্যান্য হালাত ও গোপনভেদও প্রকাশ পায় এবং এই বেলায়েতের নূর চাঁদের নূরের মত। এই মাকামের উপর যখন দৃঢ়তা এবং শক্তি পয়দা করা হয়, তখন সালেক এজাজত লাভের উপযুক্ত নির্ধারিত হয়ে যায়। বেলায়েতে কুবরা যার নূর দুপুরের সূর্যের মত হয়, তা হাসিল হলে এমনিতেই এজাজত লাভে ধন্য হয়।

হাকীকতে ফানা ও বাকা ঃ

হাকীকতে ফানা ও বাকার ফলাফল ঃ

হাকিকতে ফানা হাসিলের পর সালেক যে উদ্দেশ্যের উপর মুতাওয়াজ্জু হয়, আল্লাহ্ পাক তার পূর্ণতা প্রদান করেন। কোন এমন ব্যক্তির উপর যে শরীয়তের উপর সুদৃঢ় নয়, এলকায়ে তাওবাহ এর জন্য তার হালের উপর মুতাওয়াজ্জু হয়ে হিম্মত করবে, যেন যোগ্যতার শক্তি যা আল্লাহ্র অনুগ্রহে তেমার নাফসে পরিপক্ক হয়েছে, তা তার নাফস-এর হাসিল হয়ে যায়। এভাবে কয়েকবার মুতাওয়াজ্জু হবে অথবা নিজে নিজেকে গোনাহগার লোক বলে খেয়ালে ধারনা করবে এবং কয়েকদিন তাওবা ও এস্তেগফার করবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ শরীয়াতের উপর কায়েম হয়ে যাবে। আর মুশকিলাত অপসারণের যা তার মকসুদ, তার খেয়াল রেখে হিম্মত করবে। যেন উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। রুগ্নকে সঠিক ও সুস্থ মনে করে হিম্মত করবে অথবা রোগ নিরাময়ের ইচ্ছা পোষণ করবে, যাতে আল্লাহর অনুগ্রহে শাফা লাভ করে।

অন্যের বাতেনী খেয়ালকে বুঝার জন্য যার অন্তরে নির্ভয় ও পরিচ্ছন্নতা হাসিল হয়েছে, তার জন্য তেমন মুশকিল নয়। অন্যের দিলের বিপক্ষে নিজের দিলকে মুতাওয়াজ্জু করবে। প্রত্যেক ভয় যা দিলে স্থান লাভ করে তা অন্যের বাতেনের। যে সকল ভয় বাতেনে আসে, তা কয়েক প্রকারের দিলের। বাম দিক থেকে আগত ভয় দীর্ঘ আশা, তীক্ষ্ণ কাজ, গোনাহের উপর সামর্থ এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের অহঙ্কার। এই ভয় হচ্ছে শয়তানী। আর দিলের ডান দিক থেকে আগত ভয়, এবাদত জিকির ও ভাল কাজের সুরতে ফেরেশতার ভয়। আর দিলের উপর দিক হতে আগত ভয় খুদী এবং আমিত্ব প্রদর্শন এবং লজ্জা ও হীনতার কারণে নাফশানী ভয় হয়ে থাকে।

উপর দিক হতে আগত ভয় প্রত্যেক বস্তুকে পরিহার করা এবং মাকামাত ও হালাত তরক করার কারণে এটা রহমানী ভয়। আলমে মিছালে গায়েবী কর্মকাণ্ড জানার জন্য ফেরেশতাগণ অবহিত করেন। গায়েবে অথবা স্বপ্নে কোন জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বারবার তাওয়াজ্জু প্রদানের পরে তা করবে। আহলুল্লাহদের বাতেন অনুধাবনের জন্য নিজেকে বর্তমান হালাত হতে শূন্য মনে করে সেই বুযুর্গের দিলের বিপরীতে রাখবে। এতে বাতেনে যে হালত পয়দা হবে তা সেই বুযুর্গের আহওয়ালের ছায়া হবে।

আহলুল্লাহ-এর বাতেন অনুভব করা ঃ

খান্দানে চিশতিয়ার অধিকাংশ সদস্যের থেকে উত্তাপ, শওক এবং বুযুর্গানে কাদেরিয়া হতে সাফাই, ঔজ্জল্য এবং আকাবেরে নকশেবন্দিয়া হতে বেখুদী ও শান্তি অনুভূত হয়। এবং বুযুর্গানে সোহরাওয়ার্দিয়ার আহওয়াল নকশেবন্দিয়ার মত। আল্লাহ্ পাক তাদের ভেদ সমূহ পবিত্র করুন। আহলুল্লাহ্র নেছবতের ফয়েজ ছিদ্র পথে সূর্যের কিরণের মত উজ্জল মনে হয়। অথবা এটা বুঝুন যে, আহ্লুল্লাদের নেছবতের ফয়েজ এরূপ যেন, মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে অথবা

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, অথবা বৃষ্টি হচ্ছে অথবা পানি প্রবাহিত হচ্ছে, অথবা সূক্ষ্ম চাদর যাতে দেহ জড়িয়ে আছে অথবা হালকা দেহ এর মত অনুভূত হয়। অনুধাবনকারীকে কলবধারীদের আহওয়ালে কলবের উপর জওক ও শওক, উত্তাপ, মহব্বত ও নেছবত পরিস্ফুট হয়। বেলায়েতে কুবরার অধিকারীদের লতিকায়ে নাফসের উপর শান্ত, নিঃশেষ হওয়া, স্থবিরতা প্রকাশ পায়। বরং সকল দেহের উপর ছেয়ে যায় এবং কামালাতে নবুওত অন্যান্য মাকামাতে মুজাদ্দেদিয়ার সূক্ষ্ম নেছবত রং হীনতা ও প্রশস্ততার সাথে সকল নমনীয়তা পরিবেষ্টন করে। বরং অনুভব হতে ইহা অধিক নিকটে যা নিকটেই দূর মনে হয়। দূরে থাকার বিষয়টি ভিন্ন। তাই এই খান্দানের নেছবতের পূর্ণ নমনীয়তা এবং রং হীনতার কারণে মানুষ দূরে থাকে। এই নেছবতকে তালাশ করে যা জওক ও শওক সংরক্ষণ করে এবং কলব ও তাজাল্লিয়ে আফয়ালীর মাকাম হতে উদ্ভূত। সে জানে না এই নমনীয়তা কোথা হতে এসেছে। অথচ এই তরীকায় পথের মধ্যে আশ্চর্যজনক জওক শওক এবং প্রেরণা উপস্থিত হয়। এই আহলে তরীকার আহওয়াল স্থায়ী এবং এই তরীকার কামেল ব্যক্তিগণ মাকামে তাজাল্লিয়ে জাতি ও দায়েমী বেপর্দা আসমা ও সিফাত এবং তাদের মর্তবার মধ্যে দৃঢ়পদ আছেন। সুতরাং রং হীনতা, চূড়ান্ত নমনীয়তা তাদের বাতেন নেছবতের গুণে পরিণত হয়েছে। অনুভবের হাত সেখান পর্যন্ত পৌঁছে না। যে ব্যক্তি উপনীত নয়, সে বলে যে, তাদের সোহবতে নিবিড়তা ও সাফাই হাসিল হয়।

আর যার এই তরীকায় জেলালে আসমা ও সিফাতের সায়রের মর্তবা অথবা তাজাল্লিয়ে সিফাতী হাসিল হয়েছে, অবশ্য এর তাওয়াজ্জুর তাছির অথবা অবস্থা অনুভব শক্তির মধ্যে আছে। মনে করে যে, তাদের বাতেন শক্তিশালী, আসলে তা নয়। বরং দায়েমী তাজাল্লিয়ে জাতির অধিকারী ফুয়ুজ ও বরকতের প্রাবল্যে বড় মর্যদায় অধিষ্ঠিত হন এবং তাদের দ্বারা উপকৃত লোকদের মধ্যে অল্প সময়ে উত্তাপ, শওক ও হুজুর পয়দা হয়। আল কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন তৈরী করে দিয়েছে।" কবি বলেছেনঃ "কাঁচা লোক হতে পাকা কাজ পরিসমাপ্ত হয় না।" অর্থাৎ অপূর্ণ সালেক হতে মোকাম্মাল ফয়েজ পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে কথা হচ্ছে এই যে, পীর পাকা চাই, যার দ্বারা পূর্ণতা হতে পারে। (ওয়াছ্ ছালাম)

খান্দানে আলীয়া নকশেবন্দিয়া ছাড়া অন্যান্য সিলসিলার মধ্যে অধিক জিকিরে জেহ্র, হাবছে নাফস, সেমা ইত্যাদির দ্বারা অধিক হালত ও অবস্থা প্রকাশ পায়। যা খান্দানে নকশেবন্দিয়ার মধ্যে মাকামে জযবা ও ফানায়ে কলবের মাকামে হাসিল হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। (খান্দানে নকশেবন্দিয়ার মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা এই)। ১। বাতেনের সম্প্রসারণ, ২। দাওয়ামে হুজুর, ৩। আনওয়ারের আধিক্য, ৪। তাওহীদে হালী, যার মধ্যে ধ্যান ধারণার চিহ্ন পর্যন্ত না থাকে।

অন্যান্য তরীকাগুলোর মধ্যে অধিক জিকির, নাফস সংবরণ, মনোনিবেশ, ছেমা, আন্তরিক উত্তাপ, জওক-শওক বেশীরভাগ প্রকাশ পায় এবং ঐ সকল অবস্থা যা মাকামে জযবা

নকশেবন্দিয়ায় ফানা অর্জিত হলে হাসিল হয়। এই দুই অবস্থার মধ্যে বহু বড় পার্থক্য রয়েছে। এখানে বাতেন নেছবতের সম্প্রসারণ, দাওয়ামে হুজুর ও অধিক আনওয়ার বরকত নসীব হয়। তাওহীদে হালী চিন্তা ছাড়াই প্রকাশ পায়। আর এ স্থলে শুধু উত্তাপ ও আত্মিক-দাহ আছে, যা বাইরের কারণে সংস্থাপিত হয়। যদি হালত তাওহীদের হয় তাহলে ধারণার প্রাবল্য ও মোরাকাবায়ে তাওহীদ হতে হবে। কিন্তু এই নেছবত যদি ফানা ও বাকায় পৌছে যায়, তাহলে আল্লাহর পথে পথিকদের অন্তরসমূহ জিন্দা করার জন্য শ্রেষ্ঠ প্রতিশেধক। কবি বলেছেনঃ "মাহবুব কাকে চায় যে তার মহব্বতের আকর্ষণ কার সাথে হয়ে যায়।"

জেনে রাখ, অধিক মোরাকাবার দ্বারা ভয় থেকে দিলের দেখাশোনা এবং ফয়েজে এলাহীর এন্তেজার উদ্দেশ্য। যার দ্বারা বাতেন নেছবতে গভীরতা ও শক্তি পয়দা হয় আর অধিক জিকরে তাহলীলে লেসানীর দ্বারা যা নিজের অস্তিত্ব এবং সকল সৃষ্টির অস্তিত্বের নফী এবং আল্লাহ্ তায়ালার সত্তার প্রতিষ্ঠার নাম, তা নির্দিষ্ট শর্তগুলোর সংস্পর্শে ফানা ও নিস্তি-শক্তিশালী হয়ে যায়। অধিক তিলাওয়াতে কুরআন দ্বারা নুরানিয়াত ও সাফা এবং অধিক এস্তেগফার ও নামাযের দ্বারা নম্রতা ও বিনয় এবং অধিক দরূদ দ্বারা অনুগ্রহ ও আজীব ঘটনাবলী প্রকাশ পায়। যদি তুমি স্বীয় নেছবতে ফানাইয়্যার দিকে মুতাওয়াজ্জু হও, তাহলে হালাত ভিন্ন হবে। আর যদি নিজের স্থায়ীত্বের নেছবতের দিকে তাওয়াজ্জু কর, তাহলে ভিন্ন আকাঙ্খা প্রতিভাত হয়। বস্তুত হালতের সময়ে যদি একটি চুল পরিমাণ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে শোকর আদায় কর, একে হালকা মনে করো না এবং কাজের হালতে ঠাণ্ডা পানির দ্বারা, যদি না হয় গরম পানির দ্বারা গোসল করার পর দুই রাকাত নামায আদায় কর এবং এস্তেগফার পাঠ কর। যদি ফয়জ দূর না হয় তাহলে পুনরায় গোসল অথবা অজু এবং বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে আশার পরিপূরণ চাও। তরতীলের সাথে কুরআন মজীদের তেলাওয়াতের সাথে মৃত্যুর স্মরণ কর, পুরনো কবরস্তান জিয়ারত কর, মঙ্গল স্থানে উপস্থিতি, প্রিয় মালের দ্বারা সদকা এবং মুর্শেদের দিকে তাওয়াজ্জু ফয়জকে প্রতিরোধ করে। হারাম লোকমা ভক্ষণে ফয়জ এবং অরুচি তিন দিন পর্যন্ত এবং সন্দেহ যুক্ত লোকমার দ্বারা সেই লোকমার হালাল হওয়া পর্যন্ত এবং ছগীরা গোনাহ থেকে অজু এবং আদায়ে নামায পর্যন্ত থাকে, হুয়াল কাবিজ, তাজাল্লির দ্বারা কবজের দূর হওয়া আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। চেষ্টা করতে থাক এবং আকর্ষনের প্রত্যাশা কর। কবি বলেছেনঃ "সে কোন্ আশেক যার অবস্থা মাহবুব জানে না এবং তার দিকে দৃষ্টি দেয় না, খাজা বেদনা সেটা নয়, চিকিৎসক মওজুদ আছে।"

কার্যক্রম ও জরুরী নসীহত ঃ

যে কোন লোকের সার্বক্ষণিক জবত ও দাওয়ামে জিকির ও ওয়াজায়েফ এবং প্রাপ্ত রুজির উপর পরিতুষ্টি নাই, আল্লাহ্র কাছে গায়রুল্লাহ প্রত্যাশা করে, সে আল্লাহর পথে অসম্পূর্ণ। হযরত খাজা বুযুর্গ ইমামে তরীকা খাজা মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন নকশেবন্দ স্বীয় তরীকার ওয়াজিফা ও আওরাদকে সহীহ হাদীস দ্বারা যা কিছু প্রমানিত হয়েছে সেগুলোর উপর নির্দিষ্ট

করেছেন। সুতরাং এই তরীকার অনুসারীদের পরিপূর্ণ এত্তেবায়ে সুন্নাত অপরিহার্য। সকালে মাছুরা দোয়াগুলো সামর্থ অনুপাতে পাঠ করা চাই। দশবার দরূদ, দশবার এস্তেগফার এবং দশবার আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম এবং আয়াতুল কুরশী একবার, সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস তিন তিনবার, ছুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী একশতবার, শয্যায় এবং রাতে শয়নের সময় পাঠ করবে। তারপর পবিত্র রূহ মাশায়েখগণের জন্য ফাতেহা পাঠ করে জিকির ও মোরাকাবায় মশগুল হয়ে যাবে এবং এশরাকের সময় দুই দিনের শোকরানা নামায, দুই রাকাত এস্তেখারাহ নামায এই নিয়তে পড়বে– হে আল্লাহ! আমি তোমার এলেম দ্বারা এস্তেখারাহ করছি, দিনে রাতে আমার জন্য যা কিছু উত্তম প্রত্যাশা হবে, তা যেন আমার সামনে চলে আসে, দুর্ভাগ্য হতে আমাকে হেফাজত করুন এবং সন্তুষ্টি প্রকাশ কর, তারপর কিতাবের পাঠও জরুরী কাজে মশগুল হবে। চাশতের সময় চার রাকাত হাদীসে বর্ণিত সালাতুল আউয়্যাবীন, এটাই নামাযে দোহা এতে 'ইন্নাহু কানা লিল্ আউয়্যাবীনা গাফুরা' পাঠ করবে। যদি সুযোগ হয় বিশ্রাম গ্রহণ করবে, যা রাত জাগার সতর্ককারী এবং দ্বি-প্রহরের পর চার রাকাত লম্বা কুনুতসহ পাঠ করবে, মাগরিবের সুন্নাতের পর ছয় রাকাত যা মানুষের নিকট সালাতুল আউয়্যাবীন বলে খ্যাত, উত্তম বিশ রাকাত পড়বে। যদি সম্ভব হয় রাতকে তিন অংশে বিভক্ত করবে। এক তৃতীয়াংশ ও শেষ অংশ আল্লাহর অধিকার সমূহ আদায়ের জন্য, মধ্যবর্তী অংশ নিজের নাফসের আরামের জন্য নির্দিষ্ট করবে। অন্যথায় রাতকে চার ভাগে বিভক্ত করাকে উৎকৃষ্ট মনে করবে। দু-প্রহর নিদ্রাই যথেষ্ট। তাহাজ্জুদের নামায যা নিদ্রার পূর্বেও যায়েজ। সামর্থহীন (যে রাতে যথাসময়ে তাহাজ্জুদ পড়তে পারে না) চাশতের সময়ে তাহাজ্জুদের ক্ষতিপূরণ জরুরী। বার রাকাত অথবা দশ রাকাত অথবা আট রাকাত যতখানি পড়তে পারে, পাঠ করবে। নফল নামাজের কেরাতে সূরা ইয়াছিন পাঠ করবে অন্যথায় সূরা এখলাস পাঠ করবে। ভোরবেলায় দোয়া ও এস্তেগফার, জিকির ও মোরাকাবা করবে। রাতের তৃতীয় অংশে যদি সজাগ হয়, তাহলে আজকার হতে ফারেগ হওয়ার পর সামান্য নিদ্রা যাবে। একে মোশাহাদার স্বপ্ন বলে। ফজরের নামায আউয়্যাল ওয়াক্তে আদায় করবে, যেন তারকা রাজির আলো চমকাতে থাকে। যে সকল দোয়া হাদীস শরীফে আছে, সেগুলোর ওয়াজিফা আদায় করবে। হাফেজে কুরআনকে তাহাজ্জুদের সময় তিলাওয়াত করা উত্তম। গায়রে হাফেজ এশরাক নামাযের পর অথবা জোহর নামাযের পর তরতীল ও উত্তম স্বরে তিলাওয়াতে মশগুল হবে এবং এক পারার পরিমাণ অথবা বেশী নির্দিষ্ট করবে। যদি জওক, শওক দেখা দেয়, তাহলে সামান্য বুলন্দ আওয়াজে মধ্যম পন্থায় তিলাওয়াত করবে।

কালেমায়ে তামজীদ ১০০ বার, দরূদ দু'শত বার এশার নামাযের পরে অথবা সব সময় যখন সুযোগ পাবে। নিয়ম ১০০০ বার, যে পরিমাণ পারবে, পাঠ করবে। এস্তেগফার 'রাব্বিগফিরলি ওয়ারহামনী ওয়া তুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত্ তাউয়্যাবুর রাহীম" ১০০ বার, রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়াহদিনিছ্ ছাবিলাল আকওয়াম '১০০ বার, আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ারহামনি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিমান তাওয়ালাদা ওয়াল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাত ২৫ বার পাঠ করবে।

জেনে রাখ, এই নামায সমূহ, তিলাওয়াত, দোয়া পাঠ হুজুরীয়ে কলব ছাড়া শুদ্ধ নয়। তাই বলেছেন যে, সালেক ফরজ, সুন্নাত, কাজা নামায আদায়ের পর জিকির ও মোরাকাবা ছাড়া আর কিছুতে মশগুল না হওয়া চাই, যেন হুজুর পাকা হয়ে যায় এবং ফামায়ে নাফস ও নৈতিক শিষ্টাচার অর্জনে সক্ষম হয়। দোয়া সমূহের মধ্যে সকল দোয়া, সকল কাজ, রুজীর কাজ, শিক্ষা দান ও গ্রহণ, যা তার সামনে আসে, এতে মশগুল হবে। অকুফে কলবী ও ইয়াদ দাশ্‌তকে আবশ্যিক জানবে। কিন্তু জটিল এলেমে মশগুল হওয়া ক্ষতিকর এবং এলমে দিনের পেশা বাতেন নেছবতকে দীর্ঘায়িত করে। বিশেষ করে এলমে হাদীস যা তাফসীর, ফিকাহ ও এলমে তাসাউফের সমষ্টি, এই শর্তে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রূহানী তাওয়াজ্জু এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শিষ্টাচার সংক্রান্ত বাণীগুলো মুখস্থ করার অনুপ্রেরণা থাকতে হবে।

হযরত খাজা আবদুল খালেক গেজ দেওয়ানী (রহঃ)-এর নসীহত সমূহ ঃ

হযরত খাজা আবদুল খালেক গেজদেওয়ানী (রহঃ) বলেন, প্রিয় ছেলে! আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি যে, এলেম, শিষ্টাচার, তাকওয়া এবং সকল আহওয়াল যা তোমার সামনে আসবে, এগুলোতে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের অনুসরণ করবে এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের দলে শামীল থাকবে, ফিকহ ও হাদীসের এলেম হাসিল করবে, জাহেল সুফীদের থেকে দূরে থাকবে, ইমাম এবং মুয়াজ্জেন হবে না। বরং জমাতে নামায পড়ার পাবন্দি করবে। খ্যাতি একটি বিপদ এবং দ্বীন ও দুনিয়া এবং আখেরাতের জন্য মুসীবত, এর প্রত্যাশী হবে না। এ থেকে বেঁচে থাকবে। কোন মনসবে বন্দী হবে না। সার্বিক খ্যাতিহীনতা এখতিয়ার করবে। কাবালুদের মধ্যে নিজের নাম লিখিও না। আদালত সমূহে যাবে না। কারও জামিন হবে না। মানুষের অসীয়াতকারী হবে না। বাদশাহ ও তার সন্তানদের সাথে সম্পর্ক রাখবে না। খানকাহ বানাবে না এবং খানকাহনশীনও হবে না। সেমাতে মশগুল হবে না। সেমা দিলকে মুর্দা করে দেয় এবং নেফাক পয়দা করে। কিন্তু সেমা অস্বীকারও করবে না। আহলে সেমার মধ্যে বহু বুযুর্গ রয়েছেন। কম বলবে, কম খাবে, কম ঘুমাবে, দৃষ্টি হতে পা দূরে রাখবে, যেমন মানুষ বাঘ দেখে পলায়ন করে। নিজের নিবিষ্টতাকে অপরিহার্য করবে। ছেলেদের, মহিলাদের, বেদয়াতীদের, আমীরদের এবং মুর্খদের সাথে মেলামেশা করবে না। হালাল রিজিক ভক্ষণ করবে ও সন্দেহ যুক্ত বস্তু হতে দূরে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব মহিলা গ্রহণ করবে না, এতে দুনিয়া প্রত্যাশী হয়ে যাবে। বেশী হাসবে না, খিলখিল হাসি থেকে দূরে থাকবে। বেশী হাসি দিলকে মুর্দা করে দেয়। সকলকেই স্নেহের নজরে দেখবে, কোন ব্যক্তিকে নিকৃষ্ট দৃষ্টিতে দেখবে না। নিজের জাহেরকে সুসজ্জিত করবে না। জাহেরের সাজ-সজ্জা বাতেনের জন্য ক্ষতিকর। মানুষের সাথে ঝগড়া করবে না এবং কোন জিনিস চাইবে না। কাউকে নিজের খেদমতের হুকুম দিবে না। দেহ, মন প্রাণ দিয়ে মাশায়েখদের খেদমত করবে। তাদের কাজে অস্বীকৃতি জানাবে না। তাদের অস্বীকারকারীগণ কখনো মুক্তি লাভ করে না। দুনিয়া এবং দুনিয়াদারদের প্রতি অহংকারী

হবে না। তোমার দিল যেন চিন্তান্বিত থাকে। তোমার দেহ রুগ্ন ও তোমার চোখ অশ্রু বর্ষণকারী। তোমার আমল খালেস, তোমার প্রার্থনা কান্নাকাটিসহ যেন হয়। তোমার লেবাস হবে পুরনো, তোমার সঙ্গী হবে দরবেশ, তোমার সম্বল হবে দারিদ্র, তোমার গৃহ মসজিদ, তোমার বন্ধু ও চিন্তাকারী হবেন আল্লাহ, যিনি পবিত্র সত্তা।

হযরত ইমাম রাব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ)-এর আহওয়াল ঃ

ইমামে রাব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানী সাহেবুত্ তরীকত হযরত শায়খ আহমাদ ফারুকী সেরহিন্দী চিশতিয়া তরীকা বুযুর্গ পিতার নিকট হাসিল করেন এবং এই সিলসিলার পবিত্র আরওয়াহ হতে ফুয়ুজ ও বারাকাত, এজাজত ও খেলাফত লাভ করেন। বাল্যকালেই হযরত শাহ কামাল কাদেরী কিথলীর প্রিয় ছিলেন এবং খেরকায়ে বরকত হযরত শাহ কামাল, হযরত শাহ সেকান্দর-এর হাতে পরিধান করেন। যাকে হযরত শাহ কামাল ঘটনার মধ্যে হযরত শাহ সেকান্দরকে হযরত মোজাদ্দেদকে খেরকা পরানোর তাকীদ করেছিলেন এবং আকাবেরে খান্দানে কাদেরিয়ার আরওয়াহ ও গাউছুছ ছাকালাইন হতে ফুয়ুজ ও বারাকাত, এজাজত ও খেলাফত লাভে ধন্য হন। এজাজতে তরীকায়ে সোহরাওয়ার্দিয়া মাওলানা ইয়াকুব ছরফী হতে, যার কামালাত কাশ্মীর অঞ্চলে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু খাস নেছবত খান্দানে নকশেবন্দিয়ার সাথে ছিল যা তিনি খাজায়ে আকাফ বাকীবিল্লাহ হতে লাভ করেছিলেন। হযরত এই শানের উপর গালেব আছেন। জিকির, শোগল, প্রচলন ও শিষ্টাচার সেভাবেই পালন করেন। সুতরাং তাবারুক ও শান্তি লাভের জন্য চারি সিলসিলার সাজারাগুলোর উল্লেখ করা জরুরী। যেন এই সিলসিলায়ে আলীয়ার অনুরক্তদের বরকত অপরিহার্য হয়।

আল্লাহ্র নিকট হতে ফুয়ুজ অর্জন ও লাভ করা সত্ত্বেও তিনি চারিটি সিলসিলার উচ্চতর অনুগ্রহে বিভূষিত ছিলেন। বুদ্ধি এই কামালাত উপলব্ধি করতে অপারগ। হযরত খাজা এই শানে অধিষ্ঠিত সম্পর্কে বলেছেন, এ সময়ে তাঁর মত আসমানের নীচে কেউ নেই এবং এই উম্মতের মধ্যে কয়েকজন হযরতের কথা জানা যায়। তাঁদের কাশফ ও মালুমাত বিশুদ্ধ এবং এই পর্যায়ের যে, আম্বিয়া (আঃ)-এর নজরে পড়ে এবং মাকতুবাত শরীফ হতে হযরত খাজার এই শান অনুধাবন করা যায়।

মোল্লা বদরুদ্দীন হাজারাতুল কুদস গ্রন্থে এবং হাশেম কাশমী বারাকাতে আহমাদিয়া গ্রন্থে এবং মোহাম্মদ এহসান রওজাতুল কাইয়্যুমিয়া গ্রন্থে এবং অন্যান্য প্রিয়জনেরা মাকামাত, তাআত ও ইবাদাত এই হযরতের পরিচয় তুলে ধরার পর লিখেছেন যে, "তাঁকে শুধু মুমিন মুত্তাকী মহব্বত করে কেবল মুনাফিকরা তাঁকে শত্রু মনে করে। মোহাম্মদ হাশেম কাশমী বারাকাতে আহমাদিয়া গ্রন্থে লিখেছেন যে, যখন হযরত খাজা নিজের সঙ্গীদেরকে মহান হযরতের নিকট উপকৃত হওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়ে সেরহিন্দ প্রেরণ করেছেন– এক ব্যক্তি হযরত খাজার নির্দেশ অমান্য করল। সে স্বপ্নে দেখল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই হযরতের ভাষণ দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, মকবুল মিয়া আহমাদ আমাদের নিকট মকবুল আর মরদুদ মিয়া আহমাদ আমাদের কাছে মরদুদ।

হযরত শায়খ আবদুল হক এই পুস্তিকার শেষ প্রান্তে যেখানে তিনি এই হযরতের কথার মধ্যে প্রশ্ন করেছেন, লিখেছেন যে, আমাকে তাঁর সম্পর্কে এই আয়াতে কারীমা এলকা করা হয়েছেঃ "ওয়া ইয়্যাকু কাজিবান ফা আলাইহি কিজবুহু, ওয়া ইয়্যাকু ছাদিকান ইউছিব কুম বাদাল্লাজি ইয়াইদুকুম"। এটা সুস্পষ্ট যে, এই আয়াত ফেরাউন ও তার সাথীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা তাকে সন্দহ করত। সুবহানাল্লাহ! এই হযরত মূশাভিউল মাশরাব ছিলেন। যদিও হযরত শায়খের অধিক রাগের কারণে এই আয়াতে কারীমার দ্বারা সন্দেহ দূরীভূত হয়নি, কিন্তু কয়েক বছর পর এই হযরতের কামালাতকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সুতরাং শায়খ আবদুল হক হযরত হুচ্ছামুদ্দীন আহমদের কাছে যে পত্র লিখেছিলেন, এতে উল্লেখ রয়েছে যে তিনি অনীহা থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং বলেছেন যে, এমন বন্ধুদেরকে খারাপ বলতে নেই। কারও একরার বা এনকার এবং অর্থহীন কথার দ্বারা সূক্ষ্ম মায়ারেফের কোনই সম্পর্ক নেই। তা ধর্তব্যও নয়। যার দৃষ্টিশক্তি সতেজ, তার নজর কাশফের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত এবং দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নদের কথায় আপত্তি করলে কোন একটা সিদ্ধান্ত অবশ্যই আসে।

এতকিছুর পরও মাওলানা মোহাম্মদ বেগ বদখশী এই হযরতের কথার উপর আপত্তি দুর করার জন্য মক্কা শরীফে পুস্তিকা লিখে মুফতীদের সীল মোহরসহ চার মাযহাবের মুফতীদের পর্যন্ত পৌছিয়েছেন, যা কার্যত: এখানে আছে। এই হযরতের অন্যান্য বন্ধুরাও এই কষ্টদায়ক ব্যবহারের সমালোচনা করে আল্লাহ্‌র পথের সুলুকে সম্মান লাভ করেছেন এবং হযরত নিজেও আপত্তির অপসরণ করেছেন। আহলে ইনসাফ হাছাদ ও কিনা হতে দূরে থাকেন। হযরতের জবাবও আপত্তি প্রতিরোধক। তিনি বলেছেন, আমার কথা ধ্যান মগ্নতা হতে খালী নয়। খালেস নির্ভরতা আওয়ামদের নসীব হয়। তিনি বলেছেনঃ এই পথে সন্দেহ অনেক, ছায়ার সন্দেহ আমলের সাথে এবং উরূজ ও নুযুলের মধ্যে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক যাকে হেফাজতে রাখেন। তিনি বলেন, কিতাব ও সুন্নাতের খেলাফ কাশ্‌ফ ও মায়ারেফ মকবুল নয়। এই তিনটি বাক্যের দ্বারা এই হযরতের কথার প্রতিবাদের উত্তর হয়ে যায়। প্রত্যেক আপত্তির জবাব মাকতুবাত শরীফে আছে। সেখানে দেখা যেতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্যকর মায়ারেফ ও অভিনব মাকামাত জারী হওয়ার দ্বারা এবং মায়ারেফের স্থিরতার পর পূর্ববর্তীদের উপর কোন ক্ষতি আরোপিত হয় না। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার প্রকাশের পর পূর্ববর্তী উম্মতদের কোন ক্ষতি হয়নি। হযরত ইমাম শাফেয়ী এর নতুন মাযহাব যিনি ইমাম মালেকের শাগরিদ এতে ইমাম মালেকের মাযহাব ত্রুটিযুক্ত হয়নি। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ তায়ালার মারেফাত ঐ ব্যক্তির উপর হারাম যে নিজেকে ফিরিঙ্গি কাফেরদের থেকে উত্তম মনে করে। সুতরাং ঐ ব্যক্তির হাল কি হবে যে নিজেকে আকাবেরে দ্বীনকে উত্তম মনে করে? তিনি বলেছেনঃ আমি আকাবেরে দ্বীনের দৌলতের স্তূপের এক নগন্য খোসা চয়নকারী এবং তাদের নেয়ামতের খাঞ্চাগুলো হতে কোচর ভর্তিকারী। কেননা বিভিন্নভাবে আমাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং করম ও এহসানের আধিক্য আমাকে উপকৃত করেছে। এই

বয়বৃদ্ধদের অধিকার নিজের উপর প্রাধান্য দেই। তিনি আরও বলেন এই উলুম ও মায়ারেফ, ওয়াহ্দাতে ওয়াজুদ, সত্ত্বাগত পরিবেষ্টনের স্রোত ইত্যাদি সেই আকাবেরদের মধ্য পথেই সমুপস্থিত হয়ে থাকবে এবং এই অবস্থার উন্নতী ঘটে থাকবে।

তুমি যদি আউলিয়া আল্লাহদের কথা অনুসরণ কর, তাহলে দেখবে যে, কত উচ্চাঙ্গের কথা এই প্রিয়জনদের নিকট হতে প্রকাশ পেয়েছে। এক বুযুর্গ বলেছেন- সুবহানী মা আজামু শানী, লেওয়ায়ি আরফাউ মিন লিওয়াই মুহাম্মাদ (সাঃ)। কেউ বলেনঃ সকল অলী আল্লাহ্‌র গর্দানের উপর আমার কদম। কেউ বলেনঃ আমার কদম সকল অলী আল্লাহ্‌র কপালের উপর। এর মধ্যে সকল আউলিয়া আল্লাহ্ হতে উত্তম ইমাম মাহদী (আঃ)-ও রয়েছেন। আবার কেউ বলেনঃ কুরব এর মাকামাতে নিজ থেকে এক কদম উত্তম দেখেছি। আমার অনুভূতি জাগল যে, কোন সত্তা আমার অগ্রে রয়েছেন। বলা হয়েছে যে, এই কদম মোবারক রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর। আমার অন্তর শান্তি লাভ করল। কেউ বলেছেন যে, মাকামাতে কুরব এর দরিয়া অতিক্রম করেছি। আম্বিয়া (আঃ) দরিয়ার এই প্রান্তে রয়ে গেছেন। শায়খ মহিউদ্দীন নিজেকে 'খতমে বেলায়েত' বলে লিখেছেন এবং বলেছেন যে, 'খতমে রেসালাত' 'খতমে বেলায়েত' হতে উপকৃত হয়।

সুতরাং সেই আকাবেরদের কথার উপকারিতা তাদের অনুসারীগণ ব্যাখ্যা করেন। হয়ত হালের আধিক্যে, অথবা মাকামাতের প্রকাশের মধ্যে অথবা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের শোকর গুজারীস্বরূপ, অথবা শুধু প্রকাশ্য এবারতের জন্য, তাদের বুযুর্গদের শব্দাবলীর উদ্দেশ্য হতে বিচ্যুত হন না। ইনসাফের দৃষ্টিতে সেই আপত্তির জবাব হয়ে যায়, যা জাহের দর্শনকারী লোক এই হযরতের কথার উপর ভ্রান্ত ধারণা করে। তুমি সন্দেহকারীদের মধ্যে হয়ো না। উলুমে মায়ারেফ যা কিতাব ও সুন্নাতের মোয়াফেক তার অবর্ণিত শব্দাবলীর ব্যাখ্যা ছেড়ে দেয়া উচিত ও আপত্তি উত্থাপন করতে নেই। এদের অস্বীকারকারীরা ভীতিপ্রদ মহলে রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ আনসারী বলেছেন, অস্বীকার করো না, অস্বীকার নিন্দনীয়। অস্বীকার করে যে এই কাজ হতে বঞ্চিত। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে স্বীয় মহব্বত এবং স্বীয় বন্ধুদের মহব্বত দান করুন। আমীন! মানুষ তার সাথেই থাকবে, যাকে সে মহব্বত করে।

তাম্মাত বিল খায়ের।